বন্ধনী

শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী

আর্য্য সাহিত্য ভবন

কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা

প্রকাশক—

শ্রীবারিদকান্তি বসু

আশ্বিন, ১৩৩৭

মহালয়া

মুদ্রাকর—

শ্রীআশুতোষ মজুমদার

বি, পি, এম্‌স্‌ প্রেস

২২।৫বি, রামাপুকুর লেন, কলি

দেড় টাকা

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু

শ্রদ্ধাভাজনেষু—

উপন্যাসখানি ধারাবাহিক ভাবে 'উত্তরায়' প্রকাশিত হইয়াছিল। 'মক্ষিরাণী' নামটি রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে-বাইরে' হইতে লওয়া। বন্ধুরা বলেন, এজন্য একটা ঋণ স্বীকার করা প্রয়োজন। আমি বলি, কবিগুরুর কাছে ঋণ স্বীকার করার সত্যই কি কোনো প্রয়োজন আছে?

রণ-কুয়াসা

এই নিজ্জ্বলাকে কেন্দ্র করিয়াই বিপ্লবের দলটি গড়িয়া উঠিতেছিল। ছেলেরা বলিত, মঞ্জিদিদি,—বড়রা বলিত, মঞ্জিরাণী। এ নামটি দেওয়া জীমূতবাহনের।

চার মাসের মেয়ে রাখিয়া সাত দিন আগে-পিছু মা-বাপ দুজনেই বৈতরণী পাড়ি দেন। জীমূত তখন বছর দশেকের। তারপর হইতেই ছোট বোনটিকে তিনি যেন কোলে-পিঠে করিয়া মানুষ করিতেছিলেন। কুড়ি বছরের যৌবনোচ্ছল, লাবণ্য-ঢল-ঢল মেয়ে, কিন্তু ঠিক যেন সেই কচিটিই আজও রহিয়া গেছে।

চোখে যৌবনের আগুন হয়তো জ্বলে কিন্তু ছোট মেয়ের কলহাস্যও অক্ষয় আছে।

কুড়ি বছরের মেয়ে, কিন্তু ইহারই শাসনে বড় হইতে ছোট পর্য্যন্ত সবাই ত্রস্ত। বাধা মানে না কেবল সমীরণ। বাহির হইতে তার কোনো দীপ্তিই প্রকাশ পায় না, কিন্তু এত সহজে পাশ দিয়া লঘুচ্ছন্দে সে বহিয়া যায় যে, সবাই বুঝে কোনো বন্ধনেই ইহাকে বাঁধিবার উপায় নাই।

বন্ধনী

মক্ষিরাণী ঝঙ্কার দিয়া বলে, মেজদা, তোমার আদুরে দুলালটিকে নিয়ে পারিনে বাপু। ওর যখন যা খুসী তাই করবে, বললে কথা শোনে না।

জীমূতবাহন হাসেন, বলেন,—বেশ তো, করুক না যা খুসী। অন্যায় তো কিছু করে নি।

আদর করিবার জন্য মেজদা মক্ষিরাণীর দিকে হাত বাড়ান। কিন্তু হাত ঠেলিয়া ফেলিয়া অভিমানিনী বলে,—না, কিছু অন্যায় করে নি। তোমার 'নধ্যমণি' কখনো অন্যায় করতে পারে? একবার জিগ্যেস করতো, সকাল থেকে ও কিছু খেয়েছে কি না?

হাসিয়া মেজদা বলেন,—এই! আচ্ছা, আমি জিগ্যেস করছি। মণি, মণি,—

ডাকিবার ভঙ্গী দেখিয়া মক্ষিরাণী রাগিয়া বলে,—ডাকো, তোমার মণিকে। আমার অন্য কাজ আছে, আমি চললাম।

মেজদার স্নেহের অংশ লইয়া সমীরণের উপর বিদ্যুতের যে হিংসার ভাব আছে, মেজদার চোখে তাহা অনেক দিনই ধরা পড়িয়াছে। তা ছাড়া এমনি করিয়া সমীরণকে সামলাইবার জন্য বিদ্যুৎকে বারম্বার মেজদার শরণ লইতে হয়। হিংসা ছাড়া সমীরণের ওপর রাগের এও একটা কারণ।

ব্যাপার দেখিয়া হাসেন কেবল পণ্ডিত মহাশয়। দলের মধ্যে বয়স হিসাবে ইনিই সর্ব্বাপেক্ষা প্রবীণ এবং একদফা সংসারাশ্রম সারিয়া তবে এই দলে আশ্রয় লইয়াছেন। বয়স চল্লিশ পার হইয়াছে, একটু নাদুস-নুদুস দেখিতে; কিন্তু হাতের পেশীগুলা লোহার মতো শক্ত।

তিনি বলেন—ও ছোঁড়া থাক্‌গে বোসে ভাই মক্ষিরাণী, তুই কেন ওর জন্যে বোসে থাকিস? তুই খেয়ে নিগে। মাঝিজন্মে পেট ভরে কিনা আজ বরং ওর সেই শিক্ষাই হোক।

বিদ্যুৎ হাসিয়া বলে,—মেয়ে মানুষে তাই কখনো পারে পণ্ডিত মশাই?

ঘাড় নাড়িয়া পণ্ডিত মহাশয় বলেন,—কিন্তু যে মেয়েকে দলকে নিজের হাতে কেল্লা ওড়াতে হবে তাকে যে পারতেই হবে।

বিদ্যুৎ হাসিয়া বলে,—আপনার সঙ্গে তর্কে পারবার যো নেই।

বিদ্যুৎ খাইতে চলিয়া যায়, তবু যাইবার সময় অনাবশ্যক ভাবে সমীরণের ঘরের সামনে দিয়া শব্দ করিয়া যায়।

সমীরণ তখনও ধ্যানমগ্ন।

এমন সময় তেতালার একটা অন্ধকার কুঠুরী হইতে

অতি সন্তর্পণে গুটি তিনেক ছেলে বাহির হইয়া আসিয়া দরজা তালাবন্ধ করিয়া দিল এবং হাসিতে-হাসিতে সমীরণের ঘরে প্রবেশ করিল।

বিমল সায়েন্স কলেজে পড়ে, সমীরণের সমবয়সী। বেশী পড়া সে মোটে সহিতে পারে না। সমীরণের সুমুখের বইখানা ছুঁড়িয়া তাকের উপর ফেলিয়া দিয়া বলিল,—শুধু থিওরী, শুধু থিওরী। কাজ করো—থিওরীতে কিছু হবে না।

সমীরণ হাসিয়া বলিল—হ'য়ে গেল?

বিমল বুকে তিনটা চাপড় দিয়া বলিল,—হবে না? একেবারে ফাষ্ট ক্লাস জিনিস,—most up to date. কিন্তু সে বিকেলে দেখবে এখন। ভয়ানক ক্ষিদে পেয়েছে। আগে কিছু খেয়ে নেওয়া যাক।

সবাই উঠিয়া বাহির হইয়া গেল।

কয়দিন হইতে জীমূতবাহন একেবারে যেন শান্ত হইয়া গেছেন। ছোট-ছোট ছেলেদের সঙ্গে হাস্য-পরিহাস, ক্রীড়া-কৌতুক সব বন্ধ করিয়া, কি জানি কেন, তেতালার ঘরে অর্গলরুদ্ধ করিয়া দিয়াছেন।

বন্ধনী

প্রথম-প্রথম কেহ বড় কিছু লক্ষ্য করে নাই। কিন্তু দিন কতক পরে সবাই চঞ্চল হইয়া উঠিল।

জীমূতবাহন যে এতদিন বেশী কিছু করিতে... তাও নয়। কিন্তু এতদিনে স...ই টের পাইল, সুস্নিগ্ধ ...কৌতুকের মধ্য দিয়াই এই একটি লোক প্রত্যেকের প্রতিদিনের এবং নিত্যাকারের জীবনে কতখানি শক্তি সঞ্চার করিতেছে।

বিদ্যুৎ বার ... ছিল। ইনি ছিল... করিয়া ... পাইয়া ইঁহাকে ... ...। কিন্তু এই শান্ত তপস্বী ... ... টানিয়া পরম স্নেহে মস্তক স্পর্শ ..., অত বড় চঞ্চল মেয়েও মুহূর্ত্তের মধ্যে শান্ত হইয়া পড়িল। মানুষ যেমন করিয়া মুগ্ধ চোখে ধ্রুবতারার প্রতি চাহিয়া থাকে, তেমনি ইঁহার চোখের পানে সে শুধু চাহিয়া রহিল।

ইচ্ছা ছিল, তর্ক করে। বাহিরে অনন্ত কাজ যাঁহার জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে, কেবল যাত্রা সুরু করিয়াই তাঁহার নিজেকে এমন করিয়া গুটাইয়া লওয়া চলে না, যে ক'টি তরুণ যৌবনের উন্মেষেই সর্ব্বস্ব ছাড়িয়া পথে দাঁড়াইয়াছে, তাহাদের ত্যাগ করা ভালো দেখায় না, ইচ্ছা ছিল এই কথাটা বুঝাইয়া দিয়া যায়।

কিন্তু তর্কের যে ভুজঙ্গ আঁকিয়া-বাঁকিয়া মনের মধ্য হইতে বাহির হইয়া আসিতেছিল, মেজদার করস্পর্শে সে যেন মন্ত্রমুগ্ধের মতো আবার কুণ্ডলী পাকাইয়া ঘুমাইয়া পড়িল। কি চলে এবং কি চলে না, কি ভালো দেখায় এবং কি ভালো দেখায় না, সে প্রশ্ন যেন ইঁহার সম্মুখে তোলাই যায় না।

সে আবার দোতালায় ফিরিয়া আসিল।

পণ্ডিত মহাশয়েরও যেন পরিবর্তন আসিল। রাজনীতি ছাড়িয়া দিয়া তিনিও কোথা হইতে এক গাদা সংস্কৃত বই আনিয়া তাহার মধ্যে ডুব দিলেন।

এই সময়ে সমীরণ যেন গা-ঝাড়া দিয়া উঠিল। ছেলে-গুলাকে এক সঙ্গে জড় করিয়া সে বলিল,—ব্যাপার দেখছ তো?

বিমল বিস্মিত হইয়া বলিল,—কি ব্যাপার?

জীমূতবাহনের পাশের ঘরেই ইহারা একটা নূতন এক্সপেরিমেণ্টে ব্যস্ত ছিল। নাওয়া-খাওয়ার সময় ছাড়া বাহির হইবারও অবকাশ পায় নাই, কোনো আলোচনা করিবারও সময় পায় নাই।

সমীরণ বলিল,—মেজদা, তেতালায় যোগে বসেছেন।

বিমল বিস্মিত হইয়া বলিল,—যোগে!

—হ্যাঁ যোগে। পণ্ডিত মশাইকেও বোধ হয় তারই

ছোঁয়াচ লেগেছে। তিনিও দেখি খানকতক সংস্কৃত পুঁথি নিয়ে ব্যস্ত। এখন কি করা উচিত?

সবাই বলিল,—হাঁ, মক্ষিদিদিকে একবার—

বোধ হয় মক্ষিদিদিকে একবার জিজ্ঞাসা করিবার কথাই তাহারা বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু সমীরণ যে রকম দীপ্ত চক্ষে তাহাদের পানে চাহিল, [illegible] [illegible] আর শেষ হইতে পাইল না।

[illegible] কাটিয়া-কাটিয়া [illegible]-আস্তে বলিল,—মক্ষিদিদির [illegible] [illegible] তোমা[illegible] কথা, তোমরা বল, এর পরে তোমরা [illegible] [illegible]। [illegible] নেই, তবু পথ চলবার সাহস আছে? [illegible] [illegible] নেই, জানা নেই,—একলা—হাত-ধরাধরি করে [illegible] মিলে চলতে যাওয়া সোজা কথা নয়। এ সব বুঝে, ভেবে—

বিমল এতক্ষণ চুপ করিয়াই ছিল। মধ্য পথে সমীরণকে বাধা দিয়া বলিল,—কিন্তু মক্ষিরাণীর মতও জানতে হবে। চলতে যদি হয়ই, তাকেও সঙ্গে নিতে হবে। যেতে যদি সে চায়, তাকে ফেলে যাই কি করে!

সমীরণ হাসিয়া বলিল,—মস্ত সমস্যা!

বিমল কি যেন বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু তাহাকে বাধা দিয়া সমীরণ বলিতে লাগিল,—মক্ষিরাণীকে নিয়ে তোমাকে

চলতে যদি হয়ই, তুমি তাই চলো। কিন্তু আমাদের আরও জোরে চলতে হবে, আরও শীগ্‌গির। আমাদের অপেক্ষা করার সময় কই ?

নারীর শক্তির প্রতি সমীরণের যে অবজ্ঞা আছে, তা বিমল জানে। এ নিয়ে দুজনের মধ্যে অনেক তর্ক হইয়া গেছে। সে তর্ক আর নতন করিয়া না তুলিয়া সে শুধু সমীরণের পিঠে একটা ... ড দিয়া বলিল,—বেশ তো, আগে তো চলাই সুরু হোক। ... পরে আমরা যদি সমানে চলতে না-ই পারি, তুমি না হয় আগেই ... বে।

এ পরিহাসে ছেলের দল সকলেই হাসিয়া উ...

শুধু দরজার গোড়ায় দাঁড়াইয়া ... লাগিল। সে যে কখন আসিয়া ওখানে দাঁড়াইয়াছে তাহা, কেহ টেরও পায় নাই।

মক্ষিরাণীর উপর সর্ব্বাগ্রে দৃষ্টি পড়িল সমীরণের।

সে কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া শুধু বলিল,—এসো মক্ষিরাণী। তোমার কথাই হচ্ছিল এতক্ষণ। এরা বলছিল—

কিন্তু মক্ষিরাণী ততক্ষণে নিজেকে সামলাইয়া লইয়াছে। এরা কি বলিতেছিল, তাহা সে নিজের কানেই শুনিয়াছে। তাই সে কথা শুনিবার আগ্রহ প্রকাশ না করিয়া সে শুধু

শান্তস্বরে বিমলকে বলিল,—তুমি একবার চেষ্টা করবে বিমল, মেজদার যদি ধ্যান ভাঙ্গে ?

বিমল বলিল,—সে কি হবে ? তুমি তো চেষ্টা করেছ।

—চেষ্টা ঠিক করতে পারি নি। তবে এ-কথা বুঝেছি, তাঁকে আর নামানো সম্ভব হবে না।

—তবে ?

সমীরণ বলিল, কিন্তু তুমি কি একলা চলতে ভয় পাও, মক্ষি ?

মক্ষিরাণী ইচ্ছা করিয়াই সমীরণকে অপমান করিল। বিদ্বেষ সহ্য যায়, কিন্তু অবজ্ঞা সহ্য যায় না।

সে যেন তার প্রশ্ন শুনিতেই পাইল না। বিমলকে প্রশ্ন করিল,—বিমল, তোমার একলা চলার সাহস আছে ?

—আছে। কিন্তু তোমায়ও তো ছাড়তে পারিনে।

মক্ষি একেবারে ছোট মেয়ের মতো হাসিয়া উঠিল।

বলিল,—ছাড়তে কে বলছে ? আর তোমরা ছাড়তে বললেও আমিই বা তোমাদের ছাড়বো কেন ? তোমরা ছাড়াতে চাইলেও কি আমাকে ছাড়াতে পারো ?

মক্ষির চোখে একটা ক্রূর হিংসা খেলিয়া গেল।

সমীরণের পানে না চাহিয়াই সে বলিল,—বিমল ভাই, তোমরা যাই মনে কর, আমরা, মানে মেয়েরা, যে মানুষ এ বিষয়ে কোনো ভুল নেই।

সমীরণ মুখ নীচু করিয়া একটু হাসিল।

বিমল তাড়াতাড়ি বলিল,—সে-কথা কে বলে? আমি অন্ততঃ যে সে-কথা বলি না, তার প্রমাণ এই যে, আমি স্থির করেছি, তোমাকেই আমাদের সামনে দাঁড়াতে হবে। জয়-পরাজয় যাই হোক, আসছে সংগ্রামে তুমিই আমাদের নেতা।

এত বড় আহ্বানের জন্য মক্ষিরাণী প্রস্তুত ছিল না। সে প্রথমে খানিকটা বিব্রত হইয়া উঠিল। একবার মনে হইল, প্রতিবাদ করে, এ আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে। কিন্তু কিছুই বলিতে পারিল না। শুধু সকলের মুখের পানে বারবার চাহিতে লাগিল।

ততক্ষণে সমস্ত ছেলে উঠিয়া একেবারে তার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। সে গভীর স্নেহে সব চেয়ে ছোটটির শিরস্পর্শ করিল।

অনেকক্ষণ পরে কি ভাবিয়া একটা গভীর নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—বেশ।

অকস্মাৎ তার সমীরণের কথা মনে পড়িল।

বলিল,—কিন্তু সমীরণ, তুমি?

সমীরণ ভালো করিয়া মাথা তুলিয়া বলিল, আমি কি, বল?

—তুমি আমার নেত্রীত্ব মেনে নেবে?

—নোব।

—কিন্তু তুমি তো,—তোমার তো আমার শক্তিতে মোটেই বিশ্বাস নেই।

—তা নেই।

—তবে ?

সমীরণ এ প্রশ্নের কোনো জবাব দিল না। শুধু দূরের পানে চাহিয়া আপন মনেই একটু হাসিল।

মক্ষি আবার বলিল,—কিন্তু আজকে থেকে আমায় যদি সামনে দাঁড়াতেই হয়, একটা কথা জানা দরকার। আচ্ছা, আমার শক্তির 'পরে তোমার এ অনাস্থা এলো কোথা থেকে ? আমি কি কোথাও কোনো দুর্ব্বলতার পরিচয় দিয়েছি ?

সমীরণ অকস্মাৎ দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল,—না, মক্ষি-রাণী, না। তুমি কোথাও কোনো দুর্ব্বলতার পরিচয় আজও দাও নি। কিন্তু আমি জানি, শেষ পর্য্যন্ত তুমি সবল থাকতে পারো না। তুমি না, কোনো মেয়ে না,—মেয়েরা তা পারে না।

সমীরণ আর দাঁড়াইল না। বাহিরে চলিয়া গেল।

কিন্তু মক্ষি যে রকম আশঙ্কা করিতেছিল, তেমন কিছুই হইল না ; অর্থাৎ সমীরণ সম্পূর্ণভাবে ওর বশ্যতা মানিয়া

লইল। তবু সমীরণের প্রতি একটা সন্দেহ ও আশঙ্কার ভাব মক্ষির রহিয়াই গেল।

বিমলের মধ্যে যে তৎপরতা আছে, তা সমীরণের মধ্যে নাই। তথাপি মক্ষির কেবলি সমীরণকে আরও কাছে টানিতে লোভ হয়। মাঝে-মাঝে নানা প্রকারে চেষ্টা যে না করে তা নয়, কিন্তু সমীরণের মুখে-চোখে এমন একটা শান্ত দৃঢ়তা আছে—যা আঘাত দিলেও টলে না।

সমীরণ যে বশ্যতা স্বীকার করিল, সে কেমন?—

মক্ষি হুকুম দিল, মেদিনীপুরে একটা কেন্দ্র স্থাপন করিতে হইবে। সমীরণ তল্পী-তল্পা বাঁধিয়া মেদিনীপুর রওনা হইল এবং দিন পনের পরে ফিরিয়া আসিয়া একটা লম্বা রিপোর্ট দিল। তারপরে আবার যে লেনিন লইয়া বসিল, বিশেষ প্রয়োজন ভিন্ন উঠিল না।

এইটে মক্ষিরাণীর ভালো লাগে না। মক্ষি মেদিনীপুরের ব্যাপার লইয়া একটা গল্প জমাইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু সমীরণ যা বলিয়াছিল, তার বেশী আর কিছুই বলিল না। সুতরাং গল্প জমিল না।

তখন মক্ষিরাণীকে তেতালায় বিমলের ঘরে গিয়াই বসিতে হয়। বিমল এক্সপেরিমেণ্টের ফাঁকে-ফাঁকে তাকে আনন্দ দিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করে। বিজ্ঞানের সাহায্যে

পৃথিবীতে কত অঘটন ঘটিতেছে, কত রকমের নূতন-নূতন আরণ্য তৈরী হইতেছে, পরমোৎসাহে সে-কথা বুঝাইতে যায়। কিন্তু বক্তার উৎসাহ শ্রোতার মধ্যে সঞ্চারিত হয় না। বিমল হাত-হেঁড়ে কাজ করিতে পারে, মুখ কম চলে।

সুতরাং মক্ষিরাণী আবার নীচে চলিয়া আসে।

বসন্ত ছেলেটিকে তার ভালো লাগে। বছর চৌদ্দ-পনের বয়স। বিমল তাহাকে উড়িষ্যার জঙ্গল হইতে সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে। এইখানেই খায়-দায় থাকে এবং নামমাত্র মেট্রোপলিটানে পড়ে। আসলে সে বিপ্লবীদেরই একজন একনিষ্ঠ কর্ম্মী।

বসন্তর জীবনের পিছনে একটা করুণ ইতিহাস আছে। তারই ছাপ ওর মুখে-চোখে ভাসে এবং মক্ষির কঠোর মনেও মমতা জাগায়।

মক্ষিকে দেখিলেই ও কেমন ফ্যাল-ফ্যাল করিয়া অনিমেষে চাহিয়া থাকে, যেন ভুলিয়া-যাওয়া কিছু ভাবিবার চেষ্টা করে। সকল দিন সেদিকে নজর দিবার মতো অবসর মক্ষির থাকে না। কিন্তু সেদিনে কি কারণে সে হঠাৎ বসন্তকে লইয়াই গল্প জমাইল।

—ও কি রে, অমন করে চেয়ে আছিস যে!

বসন্ত লজ্জায় মুখ লুকাইল।

ঠিক তখন দত্তবাবুদের বাড়ীর আড়ালে সূর্য্য অস্ত গেল।

কিন্তু যে মাকে কখনও দেখে নাই, এই চৌদ্দ বছরের ছেলে কি করিয়া এক মিনিটে তাহাকে চিনিয়া লইবে, ভাবিয়া না পাইয়া মক্ষি তার মুখের পানে বিস্মিত নয়নে চাহিয়া রহিল।

ইতিমধ্যে যে দলকে বাঁকুড়ায় ডাকাতির জন্য পাঠানো হইয়াছিল, তাহারা ফিরিয়া আসিল।

সকলেরই চোখ-মুখ বসিয়া গিয়াছে, এবং দোতালায় আসিয়া যখন তাহারা বসিল, মনে হইল, পুলিশ হেপাজতে ইহাদিগকে হাজতে টানিয়া আনা হইয়াছে।

কোনোমতে স্নানাহার সারিয়া ইহারা নিদ্রা গেল। নিদ্রা ভালো হইল না। ক্ষণে-ক্ষণে স্বপ্ন দেখিয়া চীৎকার করিয়া ওঠে। তবু বিকালের দিকে শরীর অনেকটা সুস্থ হইল, মনও অনেকটা প্রফুল্ল হইল।

তারপরে সন্ধ্যাবেলা জ্যোৎস্নালোকে ছাদের উপর সভা বসিল।

বাঁকুড়া জেলার সেই গ্রামে যে ঘটনা ঘটিয়াছিল তাহা এই—

দামোদরের তীরে বর্দ্ধিষ্ণু একটা গ্রাম। রাত্রি এগারোটার সময় তারা জন দশ-পনের সেখানে গিয়া পৌঁছিল। তখন অন্ধকার হইয়া গেছে। পাড়াগাঁয়ের লোক এগারোটার সময় বড়-একটা জাগিয়া বসিয়া থাকে না।

সদর দরজা খোলার বিশেষ অসুবিধা হইল না। দ্বার ভিতর হইতেই খুলিয়া গেল। সে ব্যবস্থা আগে হইতেই করা হইয়াছিল।

দ্বার খোলামাত্র একদল ভিতরে প্রবেশ করিল, আর একদল ঘাঁটি আগলাইতে লাগিল, এবং রে রে করিয়া মশাল জ্বালিয়া, লাঠি ঘুরাইয়া ছুটাছুটি করিতে লাগিল।

পাশের বাড়ীর দু'চারিটি লোক ব্যাপার না বুঝিয়া দরজা খুলিয়াছিল, কিন্তু ডাকাতেরা একটা ধমক দিতেই তাহারা ভয়ে অর্গল বন্ধ করিয়া দুর্গানাম জপিতে লাগিল। বাধা দিবে কে? কারও ঘরে কি কিছু আছে? ওরই মধ্যে যাহাদের ঘরে এক-আধখানা লাঠি আছে তাহারাও লাঠি ধরিতে জানে না।

একটু দূরেই একটা তরুণ সমিতির আখড়া আছে। কিন্তু রিভলভারের সুমুখে তারাও বড় সাহস পাইল না।

একটা ঘরে বুড়ার ছেলে সস্ত্রীক ঘুমাইতেছিল। গোটা কতক আঘাত দিতেই দরজা ভাঙ্গিয়া গেল। বুড়ার ছেলেকে আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধিয়া ফেলা হইল। কিন্তু তার তখন এমন অবস্থা যে, কান ধরিয়া টানিবার এবং পা ধরিয়া ছেঁচড়াইবার পরেও তার মুখ দিয়া একটা কথা বাহির হইল না।

তার স্ত্রী তখন মূর্চ্ছা গিয়াছেন। তাঁরই গায়ের গোটা কয়েক গহনা মিলিল।

ও-ঘরে তখন বুড়া ও তার স্ত্রীকে লইয়াও তুমুল কাণ্ড চলিতেছিল!

ডাকাতেরা বৃদ্ধা ভদ্র মহিলাকে সশ্রদ্ধভাবে মাতৃসম্বোধন করিয়া তাঁর গায়ের সমস্ত গহনাগুলি চাহিল। মায়ের মনে তথাপি এই মুখোসপরা, মশাল এবং অস্ত্রধারী সন্তানগুলির প্রতি বাৎসল্য আসিল না! তিনি সমানে ডাকাতদের সঙ্গে ধ্বস্তাধ্বস্তি করিতে লাগিলেন। কিন্তু একখানি গহনাও রক্ষা হইল না, লাভের মধ্যে বাঁ হাতের দুইটা আঙ্গুল ভাঙ্গিয়া গেল।

খোয়ার হইল বুড়ারই সব চেয়ে বেশী। মশালের ছ্যাকা, লাঠির আঘাত এবং অশেষ প্রকার নির্য্যাতনের পরেও বুড়া সবিনয়ে জানাইল, তাহার কাছে একটি পয়সা মিলিবে

না, মারিয়া ফেলিলেও না। আয়রণ সেফ খুলিয়া একগাদা বন্ধকী দলিল ও হাণ্ডনোট ছাড়া নগদ গোটা চল্লিশ টাকা পাওয়া গেল। রাত তখন তিনটা। সুতরাং তাহাই লইয়া ডাকাতেরা সরিয়া পড়িল।

নৌকা ঘাটে বাঁধাই ছিল। নিজেদের একবার গণিয়া লইয়া 'দুর্গা' বলিয়া বাঁধন খুলিয়া দিল।

পরের দিন পুলিশ আসিল তদন্তে। বুড়া কাঁদিতে কাঁদিতে বিশ হাজার টাকা চুরি যাওয়ার এক ফর্দ দিল এবং যত কিছু বন্ধকী গহনা তাহার কাছে ছিল, সবই যে ডাকাতে লইয়া গিয়াছে একথা পুনঃ পুনঃ জানাইয়া দিল। পুলিশ বাড়ীর চারিদিক একবার ঘুরিয়া আসিল, সমস্ত দিন গ্রামের ছেলে-বুড়া সকলকে সহস্র রকমের প্রশ্ন করিল এবং সন্ধ্যার পর বুড়াকে নিভৃতে ডাকিয়া লইয়া শুধাইল,—আচ্ছা, এই তরুণ সমিতি করেছে, এরা সব কেমন?

বুড়া মাথা চুলকাইতে লাগিল এবং একটু ইতস্ততঃ করিয়া চুপ করিয়া গেল।

উৎসাহ পাইয়া পুলিশ বলিল,—এরা কি করে? ঐ ত কগুলো জিম্‌নাষ্টিক্ বার, লাঠি-সোটা তো দেখলাম।

বুড়া বলিল,—তা খেলে,—লাঠি-টাঠি খেলে, ড্রাং-গেটেও আছে।

পুলিশ আর কোনো প্রশ্ন করিল না। রাত্রির মধ্যে তরুণ সমিতির সমস্ত ছেলের বাড়ী ঘেরাও করিয়া এবং খানাতল্লাস করিয়া সন্দেহজনক কিছু পাইল না বটে, তথাপি গুটি তিনেক ছেলেকে বাঁধিয়া থানায় লইয়া গেল।

জ্যোৎস্নালোকে ছাদের উপর যে সভা বসিল, তাহাতে বাঁকুড়া অভিযানের নেতা বলিল—নগদে গহনায় যা পাওয়া গেছে তা চার হাজারের বেশী হবে না।

সবাই সমস্বরে বলিল,—মোটে!

অবনী হাসিয়া বলিল,—মোটে নয়। সে বুড়োকে তো দেখো নি। ওই যা হয়েছে তাই ঢের। বুড়ো মরবে তবু টাকা বের করবে না।

মক্ষির চোখ দুটো দপ্ দপ্ করিতে লাগিল। তার আশা ছিল অন্ততঃ হাজার বিশেক পাওয়া যাবেই। সে বলিল,—দিলে না কেন বুড়োকে শেষ কোরে?

অবনী হাসিয়া বলিল,—কি হোতো! খুন করলে আর একটি পয়সা বের হোত না।

বন্ধনী

অবনী বলিতে লাগিল,—ওখানকার কাজ বেশ নির্ব্বিঘ্নেই হয়ে গেল। কিন্তু রাস্তায় পুলিশ পিছু নিল। মধ্যখানে এক জায়গায়,—তখন বেলা তিনটে, ক্ষিদেয় প্রাণ ফেটে যাচ্ছে—লাগালাম নৌকো। কিছু খাবার কিনতে ওরা গেল গ্রামের মধ্যে, আমরা জন বারো নৌকায় বসে রয়েছি। খানিক পরে দেখি, ওরা ছুটতে ছুটতে আসছে, পিছনে এক ব্যাটা কনষ্টেবল ওদের তাড়া করেছে। লাফ দিয়ে ওরাও পড়লো নৌকোয়, কনষ্টেবলটাও পড়লো নৌকোয়। নৌকো তখন ছেড়ে দিইছি। কনষ্টেবলটার মুখ বেঁধে দিলাম চিং করে শুইয়ে।

খুব জোরেই নৌকো চালিয়েছি। ষ্টেশনে পৌঁছুতে আরও ঘণ্টা তিনেক দেরী! কনষ্টেবলটা কেবল কাকুতি করে। কিন্তু আমরা দেখলাম, ওকে ছাড়িই বা কি কোরে। যেখানে ছাড়বো, সেইখানেই তো ও সব কথা বলে দেবে।

পরামর্শ সভা বসলো। স্থির হোলো ওকে মেরে নদীতে ফেলে দেওয়া হবে। ও সমস্ত কথাই শুনতে পাচ্ছিলো। ওকে বললাম, আর এক ঘণ্টা পরে তোমাকে মেরে নদীতে ফেলে দেওয়া হবে। ওর মুখ বাঁধা। শুনে একবার ও শিউরে উঠলো। তার পরে এক ঘণ্টার মধ্যে ওর চোখ বসে গেল, গাল ভেঙ্গে গেল, হাত-পা অসাড়, জোরে

গেল, এমন কি চোখের দৃষ্টি পর্য্যন্ত যেন ঝাপ্‌সা হোয়ে গেল।

যখন ফেলতে যাচ্ছি, তখন প্রাণপণে একবার পা দুটো জড়িয়ে ধরতে এলো। কিন্তু পারলে না।

সবাই হাসিতে লাগিল।

মক্ষি বলিল—কি কোরে ফেললে?

—সম্পূর্ণ অহিংসভাবে। ছোরা মারলাম না, গুলি করলাম না, কোথাও এক ফোঁটা রক্ত পড়লো না,—একটি বড় বস্তার মধ্যে হাত-পা গুটিয়ে পুরে, মুখ বন্ধ কোরে একেবারে দামোদরের জলে—টুপ্‌।

মক্ষি উল্লসিত হইয়া উঠিল। বলিল,—বেশ করেছ।

সবাই হাসিল।

কেবল একখানি মেঘের আড়ালে চাঁদ যেখানে ডুব-সাঁতার দিতেছিল, সমীরণ একদৃষ্টে সেদিকে চাহিয়া রহিল। কি যেন একটা কথা একবার বলিতে গিয়া থামিয়া গেল।

তার পানে দৃষ্টি পড়িতেই মক্ষি ব্যঙ্গ করিয়া বলিল,—সমীরণ কাঁদছো?

মুখ না ফিরাইয়াই সমীরণ একটু হাসিয়া বলিল,—না, কাঁদিনি। সে সৌভাগ্য কি করেছি!

—তবে?

—ভাবছিলাম, এর পরে কি? টাকার প্রয়োজন আছে মানি, কিন্তু সে প্রয়োজন মেটাবার এই কি পথ?

মক্ষি হাসিয়া বিদ্রূপ করিয়া বলিল,—তবে কি পথ বল।

সমীরণ তার দিকে শান্তভাবে চাহিয়া বলিল,—কি যে পথ সে আমিও জানি নে। কিন্তু এতে লোকের মনের পরে যে মনোভাব হবে, তা উদ্দেশ্য-সিদ্ধির অনুকূল কিছুতেই নয়।

মক্ষি বলিল,—না-ই হল অনুকূল। যাদের বাড়ীতে ডাকাতি হবে তাদের সংখ্যা দশ হাজারে একজন। যদি তারা প্রতিকূলে যায়-ই, তাতেই বা কি হবে?

সমীরণ বলিল,—তাতেও অনেক হবে। ডাকাতি রাজনৈতিকই হোক, আর অর্থনীতিকই হোক, সাধারণ লোকের মনের পরে তার একই রকম ছাপ পড়ে।

মক্ষি প্রতিবাদে ভালো রকম কি একটা বলিতে যাইতেছিল। কিন্তু সমীরণের মনে বোধ হয় কোথাও ব্যথা লাগিয়াছিল। সে বাধা দিয়া বলিল,—কেন যে পড়ে তা তুমি বুঝবে না, মক্ষিরাণী। আমারও আজ বোঝাবার মতো মনের অবস্থা নয়। এ তর্কের মীমাংসা বরং আর একদিন হবে।

বলিয়াই সে আর দাঁড়াইল না। তর্ তর্ করি সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিয়া গেল।

সমীরণের সঙ্গে কাহারো মতের মিল নাই। রক্তের নেশা সবাই ইহারা পাগল। উদ্দাম যা-কিছু, তারি কথা এদের রক্তে নাচন লাগে। তথাপি, কি জানি কেন সমীরণ চলিয়া আসার পর সভা আর জমিল না।

বিমল সভায় উল্লাস সঞ্চার করিবার একটা চেষ্টা করিল। একটা ছোট-খাটো বক্তৃতাও দিতে গেল কিন্তু মধ্যপথেই মক্ষি উঠিয়া পড়িয়া বলিল,—আচ্ছা আজকে সব বিশ্রাম করো গে। কাল সকালে কালকের প্রোগ্রাম স্থির হবে।

ঘরে আসিয়াও মক্ষি স্থির হইতে পারিল না একবার ঘুমাইবার চেষ্টা করিল; ঘুম আসিল না একখানি বই লইয়া পড়িতে বসিল; ভালো লাগিল না শেষে ঘরের মধ্যেই খানিকটা পায়চারি করিতে লাগিল

সমীরণকে সে আজও বুঝিতে পারিল না। কি চা সে? উৎসাহের মধ্যখানে সকল-কিছুর উপর এ

করিয়া জল ছিটাইয়া দেয় কেন? তার কি নেতৃত্বের লোভ আছে? মাঝে-মাঝে এমন করিয়া সে মঙ্গিকে অপদস্থ করে, এমন করিয়া বুঝাইয়া দেয় যে, এ নিতান্ত ছেলেখেলা এবং তারপরে এমন করিয়া নিজগর্ভে সরিয়া পড়ে যে, রাগে মঙ্গি ভাষা খুঁজিয়া পায় না।

কখনো কখনো মঙ্গি সমস্ত ব্যাপারটিকে হাসিয়া উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করে। সমীরণের মেয়েমানুষ হওয়া উচিত ছিল এই ভাবিয়া হাসিতে চেষ্টা করে; পারে না। সমীরণের একটা কোমলতা আছে, কিন্তু তা মেয়েলি নয়।

ঘরের মধ্যে মঙ্গি থাকিতে পারিল না। দ্বার খুলিয়া ছাদে চলিল।

গিয়া দেখে, সমীরণ একটা আলিসার উপর বসিয়া দূরের দিকে নির্ণিমেষে চাহিয়া আছে,—হাঁটুর উপর হাত দুইটি বদ্ধাঞ্জলি।

মঙ্গির একবার মনে হইল ফিরিয়া যায়। আবার মনে হইল, ভালোই হইয়াছে। সমীরণকে নির্জ্জনে তার একবার পাওয়া দরকার ছিল, তার অভিমত স্পষ্ট করিয়া জানা প্রয়োজন।

সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইতেই সমীরণ যেন অকস্মাৎ চমকিয়া উঠিল। বলিল,—কে, মঙ্গি? বোসো।

সমীরণকে কড়া কথা শোনাইবার জন্ম মক্ষি কেবল প্রস্তুত হইতেছিল। কিন্তু তার এই চমকিত ভাবে যেন সহজ অবস্থা ফিরিয়া আসিল।

হাসিয়া বলিল,—কি ভাবছিলে? মানুষে মানুষের রক্তপাত কি কোরে করে, তাই?

—রক্তপাত? ও, না, না, আমি ভাবছিলাম,—সমীরণ অকস্মাৎ থামিয়া পড়িল।

সমীরণের ভাবনার কথা জানিতে চাহিবে কি না মক্ষি তাহা ভাবিতে-ভাবিতে সমীরণ বলিল,—চাঁদনী রাত্রে আমি রোজ ছাদে আসি। চাঁদের আলোর কেমন একটা যাদু আছে।

একটু থামিয়া আবার বলিল,—ভাবছিলাম, এই চাঁদের আলোয় যদি আমার পূর্ব্ব জন্মের প্রিয়া কৌমুদীর ঢেউ ঠেলে আজকে হঠাৎ আমার সামনে এসে দাঁড়ায়, আমি বোধ হয় তাকে চিনতে পারি।

সমীরণের চিন্তার বহর দেখিয়া মক্ষি বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া তার দিকে শুধু চাহিয়া রহিল।

মক্ষির পানে না চাহিয়াই সমীরণ বলিতে লাগিল, যেন ঘুমের ঘোরে-ঘোরে,—এরে আগে লক্ষ দেশে, লক্ষরূপে লক্ষবার জন্মেছি। লক্ষবারই আমার চিরন্তনী প্রিয়া এসে

...পে দাঁড়িয়েছে—একটি বারও চিনতে ভুল হয় নি।
...ও যদি আসে—

সমীরণের স্বপ্নবিহ্বল চোখ অকস্মাৎ মক্ষির মুখের উপর নিবদ্ধ হইল, আর ফিরিতে চাহিল না।

সে দৃষ্টিতে মক্ষির কেমন একটা অস্বস্তি বোধ হইল। আপনার অজ্ঞাতেই শাড়ীর আঁচল মাথায় দিবার জন্য টানিল। কিন্তু পরক্ষণেই হাসিয়া বলিল,—নিশ্চিন্ত থাকো সমীরণ, ...কে অন্ততঃ সে আর আসছে না। কিন্তু এ দল তুমি ...ড়ো।

অকস্মাৎ সমীরণের যেন সম্বিৎ ফিরিল। সোজা হইয়া ...ড়াইয়া বলিল,—হুঁ। আচ্ছা মক্ষিরাণী, তুমি কি বিশ্বাস ...রো, আমাদের দ্বারা ভারত উদ্ধার হবে?

—করি।

—আমিও করি।

মক্ষি এইবার জোর দিয়া বলিল,—না তুমি করো না। ...মার মাঝে-মাঝে দুর্ব্বলতা আসে; মাঝে-মাঝে ভয় পাও।

সমীরণ হাসিয়া বলিল,—দুর্ব্বলতা আসে না, ভয়ও পাই ...। মাঝে-মাঝে আমার মধ্যে কেমন যেন সংশয় আসে, ...মন যেন মনে হয়, এ পথ ঠিক নয়।

—তবে কেন তুমি এ দলে থাকো?

—কারণ, এর চেয়ে ভালো পথ জানা নেই। আচ্ছা, মক্ষি, তোমাকে হরবিলাসের কথা বলেছি?—মেদিনীপুরের হরবিলাস?

—না।

—তাহোলে শোনো—

সমীরণ ছাদের আলিসার উপর আবার বসিল। মক্ষি বসিল মেঝেতেই।

—শালবনীর ওদিকে একটা ছোট গ্রামে সে থাকে। কেমন গ্রাম জানো? বড় জোর ২০।৩০ ঘর লোকের বাস। সবাই চাষী। বামুন যারা তারাও করে চাষ। গ্রামের মধ্য দিয়ে একটি মাত্র রাস্তা, তারই দু'পাশে মাটির ঘরের সারি। রাস্তায় বর্ষাকালে এক হাঁটু কাদা, আর বাকী সময় এক হাঁটু ধুলো।

না, গ্রামে মিউনিসিপালিটি নেই এবং জেলাবোর্ডের নজর অতদূর চলে না।

এমনি গ্রামে হরবিলাস থাকে। একখানি দু'কুঠুরী ঘর। তার একখানিতে সে শোয়, আর একখানি—একাধারে রান্নাঘর এবং গোয়াল।

মক্ষি সবিস্ময়ে বলিল,—গোয়াল? ও কি গরুও পুষেছে না কি?

পুষেছে। কেনারাম মণ্ডল তার মুমূর্ষু গাইটিকে ওরি হাতে সমর্পণ করেছে। হরবিলাস প্রাণপণে তার সেবা করে। ওটি ওর একসঙ্গে "গৃহিণী সচিবঃ সখীমিথঃ।" "ললিত কলাও" কিছু কিছু জানা আছে, মনে হোল।

—দুধ দেয় ?

—না। সে বয়েস তার বহুদিন পার হোয়ে গেছে। হরবিলাসের কিন্তু এখনও আশা আছে, খাইয়ে-দাইয়ে আর একটু মোটা করতে পারলে দুধ ও দেবে। সেই অসাধ্য সাধনে ও লেগে গেছে।

ও রাঁধতে রাঁধতে গীতা পড়ে, গাইটি বড় বড় নীল চোখ মেলে ওর পানে চেয়ে থাকে। মাঝে-মাঝে উঠে এসে ও গরুটির কপালে-পিঠে হাত বুলোয়, কত আদরের কথা বলে। রাত্রে ও ঘুমোয় গরুটি তখন চোখ বুজে রোমন্থন করে। তিন দিন ছিলাম, রোমন্থনের শব্দে চোখের পাতা বুজতে পারিনি।

বললাম,—যার গরু তাকে ওটি ফিরিয়ে দিও হরবিলাস। মিথ্যে পণ্ডশ্রম কোরো না।

ও বললে,—কি যে বলেন সমীরণ-দা। এবারে এসে দেখবেন ও ঠিক তিন সের কোরে দুধ দিচ্ছে। আমি গাই চিনি নে? ও কি যে-সে জাতের গরু ? ওর মা কত দুধ দিত জানেন?

আমি বললাম,—ওর মায়ের আমলে টাকায় এক মণ দুধ আর আট মণ চাল পাওয়া যেত। সে তো আজকের কথা নয়। কিন্তু ওর যে দুধ দেবার বয়েস বহুদিন পার হোয়ে গেছে। ও যে বেঁচে আছে এই ঢের।

আমার কথা ও বিশ্বাস করলে না।

সমীরণ মৃদু হাসিয়া চুপ করিল।

তার পর ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল,—কেমন জায়গায় কেমন ভাবে সে থাকে, সে না দেখলে বোঝা যাবে না। মাঝে-মাঝে ভাবি, হরবিলাস তো একা নয়, এমনি হাজার-হাজার সন্তান যে নিজেদের সর্ব্ববিধ আরাম থেকে বঞ্চিত রেখেছে, সমস্ত কামনার দ্বার রুদ্ধ কোরে যারা শুধু দেশ-প্রীতির আগুনই বড় কোরে জ্বালালো, তাদের তপস্যা কি একেবারেই ব্যর্থ হবে? কোথাও কোনো ভরসা যখন পাইনে, তখন ওদের পানে চাই, মনে হয়, আশা এখনো রয়েছে।

চাঁদ তখন পশ্চিমের দিকে ঢলিয়া পড়িয়াছে। সিঁড়ির দিকে ছাদের উপর কার যেন ছায়া পড়িল,—একটি মাথা একবার উঁকি মারিয়াই অন্তরালে ডুব দিল।

সমীরণ বলিল,—কে রে?

লোকটা সাড়া দিল না। দেখিয়া সমীরণ উঠিতে

যাইতেছিল। মক্ষি তার হাত ধরিয়া বাধা দিয়া বলিল,—থাক্, আর উঠতে হবে না। আমি জানি ও কে।

সমীরণ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার পানে চাহিয়া রহিল।

মক্ষিরাণী বলিল,—পণ্ডিত মশাই। আমি আরও কয়েকবার দেখেছি, তোমাতে আমাতে এক জায়গায় থাকলেই উনি আড়ি পাততে আসেন।

সমীরণ বিস্মিতভাবে বলিল,—কেন ?

মক্ষি হাসিয়া বলিল,—সে তো আমার জানার কথা নয়। সকালে বরং ওঁকেই জিগ্যেস কোরো।

জিজ্ঞাসা করিবার কোনো প্রয়োজন নাই। এই বয়সের দুটি নর-নারীকে নিভৃতে দেখিয়া কেহ আড়ি পাতিলে তাহার মনোভাব বুঝিতে কাহারও দেরী হয় না। 'কেন' প্রশ্নটি সমীরণ এমনি করিয়া বসিয়াছিল।

তথাপি এই ঘটনায় সে স্তব্ধভাবে খানিক পায়চারি করিতে লাগিল। কি তার চিন্তা সেই জানে। অকস্মাৎ ছাদের ও-কোণ হইতে মক্ষির সুমুখে আসিয়া বলিল,—কিন্তু আমার চাঁদের আলোর কথায় তুমি অপমানিত হওনি তো ?

মক্ষি বিব্রত ভাবে বলিল—অপমানিত হবো কেন ?

সমীরণ অত্যন্ত উত্তেজিত ভাবে তার ডান হাতে একটি ঝাঁকি দিয়া বলিল,—তুমি বিশ্বাস কর, আমি

তোমাকে অপমান করবার জন্যে কোনো কথা বলি নি। তুমি এমন একটা মুহূর্ত্তে এসেছিলে, যে মুহূর্ত্তে তোমার আসা উচিত হয় নি। তুমি—

সমীরণ কথাটা শেষ করিতে পারিল না। চঞ্চল হইলে একস্থানে সে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে ।। ছুটিয়া নীচে চলিয়া গেল।

কাল সমস্ত রাত এক রকম জাগিয়াই গেছে। নিজের ঘরে আসিয়াও মক্ষি ক্রমাগত আবোল-তাবোল ভাবিয়াছে। ভোরের দিকে কখন একটু ঘুম আসিয়াছিল সে নিজেও জানে না। যখন ঘুম ভাঙ্গিল তখন বেলা অনেক হইয়াছে। তবু তার উঠিতে ইচ্ছা করিল না। পাশ ফিরিয়া শুইয়া গত রাত্রের ভুলিয়া-যাওয়া স্বপ্ন একবার মনে করিবার চেষ্টা করিল। ঠিক মনে পড়িল না। যতদূর মনে পড়িল, চাঁদ ছিল, জ্যোৎস্নাপ্লাবিত আকাশ ছিল এবং আরও কি কি ছিল।

দোরের কাছে বসন্ত কয়বারই আসিয়া উঁকি মারিয়া ফিরিয়া গেছে। এবারে উঁকি মারিতেই একেবারে

মক্ষির সহিত চোখা-চোখি হইয়া গেল। অপ্রস্তুতভাবে সে পলাইবার উপক্রম করিতেই মক্ষি তাকে ডাক দিল।

বসন্ত আস্তে আস্তে খাটের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। মক্ষি কিন্তু কোনো কথাই তাহাকে বলিল না, চোখ বুজিয়া শুইয়া রহিল।

মক্ষিকে কেমন-যেন শ্রান্ত দেখাইতেছিল।

বসন্ত বলিল,—তোমার কি অসুখ করেছে, মক্ষি দিদি?

অসুখ ঠিক নয়। তথাপি মক্ষি বলিল,—হ্যাঁ।

বসন্ত মাথার দিকে বিছানার উপর বসিয়া বলিল,—মাথা কি ব্যথা করছে? টিপে দোব একটু?

—দে।

বসন্ত ধীরে ধীরে মক্ষির মাথা টিপিতে লাগিল। জীবনে সে কখনও সেবা পায় নাই। অসুখ তার কমই হইয়াছে। যে কয়বারও হইয়াছে, মেজ-দা কাছে বসিবার সময় বড় পান নাই। তাঁর হাতে চিরদিনই এত কাজ যে, ঘরে বসিয়া থাকিবার সময় বড় থাকিত না। বসন্তর সেবায় তার যেন ঘুম আসিতেছিল। মাথা তার ধরে নাই, জ্বরও হয় নাই। তবু মনে হইল, মাথা ধরিলেই বুঝি ভালো হইত।

এমনি ধারা নিঃশব্দে অনেকক্ষণ কাটিল।

হঠাৎ এক সময় বসন্ত ডাকিল,—মক্ষি দিদি!

এমন স্নিগ্ধস্বরে ডাক মক্ষি কখনও শোনে নাই। একখানি শিথিল বাহু বসন্তর কোলের উপর ফেলিয়া সে শুধু চোখ মেলিয়া চাহিল, কোনো কথা কহিল না।

বসন্ত বলিল,—সমীরণ-দা'কে একবার ডেকে দোবো?

মক্ষি তার কোলের উপর হইতে হাত সরাইয়া লইয়া বিস্মিতভাবে বলিল,—কেন রে?

পণ্ডিত মহাশয়ের মারফৎ গত রাত্রের অনেক কথাই প্রচারিত হইয়াছে। ছেলেমানুষ হইলেও এইটুকু সে বুঝিয়াছে, এই সময় সমীরণ আসিলে মক্ষি হয়তো খুশীই হইবে।

সে বলিল,—চুপি চুপি? আনবো ডেকে?

এতক্ষণে মক্ষির গত রাত্রের সমস্ত কথা মনে পড়িল। বুঝিল, কাল রাত্রে চাঁদের আলোয় যে মাথা উঠিয়াছিল, সে বৃথাই ওঠে নাই।

তথাপি সাধারণ মেয়ের মতো সে উত্তেজিত হইল না। বরং উঠিয়া বসিয়া শ্লথ কবরী ঠিক করিতে-করিতে ঠোঁটে হাসি টানিয়া বলিল,—কেন রে? কি হয়েছে কি আমার?

—তবে যে বলছিলে তোমার মাথা ধরেছে, অসুখ করেছে ?

মক্ষি হাসিয়া বলিল,—তা কি ? তোর সমীরণ-দা কি ডাক্তার, যে তাকে ডাকতে হবে ?

এ কথার বসন্ত কোনো উত্তর দিতে পারিল না, মুখ নামাইয়া বসিয়া রহিল।

খানিক পরে বসন্ত বলিল,—ওরা যে বলছিলো, তুমি সমীরণ-দাকে ভালোবাসো ?

—ভালো তো তোকেও বাসি রে। তা নিয়ে কেউ হিংসে করে না ?

মক্ষি খাট হইতে নামিয়া বলিল,—তোর পড়া তৈরী হয়েছে ?

পড়াশুনার উপর বসন্তর কোনোদিনই স্পৃহা নাই। সে মুখ নীচু করিল।

মক্ষি বলিল,—আমি মুখ-হাত ধুয়ে আসছি। এই ঘরে বই নিয়ে এসে পড়া তৈরী করো। বুঝলে ?

বসন্ত খানিকটা অনিচ্ছার সঙ্গেই ও-ঘর হইতে বই আনিতে গেল।

মক্ষির ফিরিয়া আসিতে পনের মিনিটের বেশী দেরী হইল না। তখন বসন্ত সুমুখে গ্রামার খুলিয়া রাখিয়া অন্য কথা ভাবিতেছে।

মক্ষিকে দেখিয়াই বসন্ত বলিল,—সত্যি, ওরা ভারি হিংসুটে, মক্ষিদিদি। তুমি যে আমাকে ভালোবাসো, এটাও ওরা সইতে পারে না।

মক্ষি তোয়ালেয় মুখ মুছিতে-মুছিতে বলিল,—তাই নাকি ?

বসন্ত জোরের সঙ্গে ঘাড় নাড়িয়া বলিল,—হ্যাঁ। ওরা আমাকে কি বোলে ঠাট্টা করে জানো ?

কি বলিয়া ঠাট্টা করিতে পারে তাহাই অনুমানে বুঝিয়া মক্ষির মুখ ভয়ে বিবর্ণ হইয়া উঠিল।

—ওরা বলে আমার নাকি বাপের ঠিক নেই।

মক্ষি উত্তেজিত ভাবে বলিল,—মিথ্যে বলে। ওরা জানে না।

নিবিড় মমতায় বসন্তর কাছে বসিয়া তার মাথার চুল ঠিক করিয়া দিতে দিতে মক্ষি বলিল,—কেউ জানুক, না জানুক ভাই, প্রত্যেকেরই বাপের ঠিক আছে। সঙ্কীর্ণ দৃষ্টি এবং সঙ্কীর্ণতর মন নিয়ে মানুষ আর পৃথিবীর কতটুকু খবর রাখতে পারে ? যা মানুষের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়, তাই যদি উড়িয়ে দিতে হয় তাহোলে অর্দ্ধেক বিষয়-বস্তুই বাদ পড়ে যায়। সংসারে পিতৃ-পরিচয়ই সব চেয়ে বড় পরিচয় নয়, বসন্ত। মানুষকে দাঁড়াতে হয় তার

নিজের পরিচয়ের ওপর। তা যদি না হতো, তাহোলে যিশুর আজ স্থান কোথায় ?

সান্ত্বনায় ও স্নেহস্পর্শে বসন্তর চোখ ফাটিয়া জল পড়িতেছিল।

মক্ষি আবার বলিল,—কোথাও কুণ্ঠা রাখিস নে ভাই, কিন্তু তোর মধ্যে তোর বাপের কোনো পরিচয় যদি থাকে, তাহোলে আমি বলছি, তোর বাপ কারো বাপের চেয়ে ছোট নন।

কথাগুলা মক্ষি জোরে-জোরেই বলিতেছিল। তার ঘরের সুমুখ দিয়া কজনই যাওয়া-আসা করিল। তাদের মধ্যে বিমলকে ডাক দিতেই বিমল ঘরে আসিয়া বলিল,—তোমার আজ উঠতে দেরী হয়েছে। শরীর খারাপ নাকি ?

মক্ষি হাসিয়া বলিল,—খারাপ ঠিক নয়। কালকে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত ছাদে ছিলাম, বোধ হয় সেই জন্যে।

বিমল শুধু বলিল,—ও।

মক্ষি বলিল,—দেখ, তুমি কি সমীরণের কাছে যাচ্ছ ?

—সমীরণের ? না তো।

—তুমি সমীরণকে একবার এ ঘরে ডেকে দেবে ? তার সঙ্গে একটা গোপন পরামর্শ আছে।

বিমল যাইতে-যাইতে বলিল,—দিচ্ছি পাঠিয়ে।

কিন্তু তখনই আবার ফিরিয়া আসিয়া বলিল,—তোমাকে বড় শ্রান্ত দেখাচ্ছে, মক্ষিরাণী। তুমি বরং কিছুদিন বিশ্রাম নাও।

মক্ষি হাসিয়া বলিল,—বিশ্রাম? বিশ্রামের দিন তো এখনো আসে নি। যেদিন আসবে সেদিন নিজেই চেয়ে নোব। আপাততঃ তুমি সমীরণকে একবার ডেকে দাও।

তারপরে আপন মনেই বলিল,—সেও বোধ হয় ওঠে নি। দু'জনেই ছাদে ছিলাম কি না।

বিমল চলিয়া গেল। সকাল বেলায় যে-কথা সে পণ্ডিত মহাশয়ের কাছে শুনিয়াছে তারপরে এমন করিয়া সমীরণকে ডাকিতে বলার স্পর্দ্ধা তাহাকে একটু বিস্মিতও করিল।

এতক্ষণ ধরিয়া বসন্ত মক্ষির কথাগুলা আপনার মনে অসীম আনন্দে রোমন্থন করিয়াছে আর কাঁদিয়াছে। যে পিতাকে সে কখনও দেখে নাই, যাঁর পরিচয় তার জন্য কেবল লজ্জাই বহন করিয়া আনিয়াছে তাঁরই প্রশংসায় তার চোখের জল আর বাধা মানিতেছিল না।

কি এক অজানা আকর্ষণে সে মক্ষির কাছে আরও ঘেঁসিয়া আসিল। তার মুখের দিকে চাহিয়া তার কেমন

ইচ্ছা হইল, বলিয়া ফেলিল,—মক্ষিদিদি, তোমাকে আমি ভালোবাসি।

এতবড় কথা এমন করিয়া আর যেন কখনও শোনে নাই এমনি আগ্রহে সে বসন্তর মাথা বুকের কাছে টানিয়া আনিয়া তার চুলে গোটা দুই নিঃশব্দ চুম্বন দিয়া অস্ফুটস্বরে বলিল,—সে আমি জানি, জানি।

কয়দিনের মধ্যে মক্ষির একটা পরিবর্ত্তন আসিল। তার চলার ভঙ্গিতে, কথায়, হাস্যে এমন একটা কমনীয়তা ও নমনীয়তা আসিল, যা সকলেরই চোখে পড়ে। সে যেন অনেকটা সহজ হইয়া আসিল। তার দেহের গঠনে, আর চোখের ও ঠোঁটের দৃঢ়তায়, তার চলার বেগে যে পৌরুষ ছিল এখন যেন তা স্বাভাবিক মনে হইতে লাগিল।

জীবনের বড় অংশ তার যাদের মধ্যে, যে আবেষ্টনীতে গঠিত হইয়াছে তাহাতে নিজেকে চিনিবার বড় বেশী সুযোগ সে পায় নাই। সকলের সঙ্গে সে জিম্‌ন্যাষ্টিক করিয়াছে, গদা ঘুরাইয়াছে, দৌড়-ঝাঁপ খেলিয়াছে,—তার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পুরুষে হার মানিয়াছে।

ভগিনীর পৌরুষে মেজ-দা গর্ব্ব অনুভব করিয়াছেন। সে-গর্ব্বের আনন্দ তারও মনকে স্পর্শ করিয়াছে। সে আরও উৎসাহে খেলায় যোগ দিয়াছে।

জীবনে নারীর সংস্পর্শলাভ কখনও তার ঘটে নাই। নারী-মনের স্নেহস্পর্শও পায় নাই। নিজের পানে চাহিয়া দেখে নাই, দেখিবার অবসর পায় নাই। বিশ্বপ্রকৃতির দিকে সে কেবল রিভলভার উঁচাইয়া ফিরিয়াছে।

এমন সময় বসন্ত তাকে যে পৃথিবীর সন্ধান দিল তাহা তার জীবনে একেবারে অপূর্ব্ব ও অভিনব। এ পৃথিবীতে একটা জাতি আর একটা জাতির বুকের উপর চাপিয়া পিষিয়া মারিতে উদ্যত হয় না, কাহারো সঙ্গে কাহারো কোনো বিদ্বেষ নাই, প্রতিযোগিতা নাই, এখানে একজন শুধু আর একজনের কাছে ঘেঁসিয়া আসিতে চায়, পরিপূর্ণ চন্দ্রালোকে, মুক্ত আকাশের তলে শুধু ক্ষণকালের সঙ্গ মাগে। এ পৃথিবীর পানে পিস্তল উঁচাইয়া চলা শুধু নিষ্ঠুরতা নয়, অত্যন্ত কদর্য্যতার চিহ্ন।

আজ তার মেজ-দাকে মনে পড়িল। যেদিন তিনি তেতালার ঘর ছাড়িয়া পথে বাহির হন, সেদিন তার বুকে এতটুকু বাজে নাই। তখন গগনস্পর্শী স্পর্দ্ধা তাকে এমনই করিয়া ভর করিয়াছিল। আকারে-ইঙ্গিতে সে তখন এই

ভাবই প্রকাশ করিয়াছে যে, যাইতেছ, যাও; কিন্তু তোমার পথ যে ভ্রান্ত এ আমি দু'দিনে প্রমাণ করিব।

মত তার আজও বদলায় নাই। নিজের মতের উপর শ্রদ্ধাও এতটুকু কমে নাই। তথাপি, যে-অশ্রুকে সে চিরদিন বিদ্রূপ করিয়া আসিয়াছে নিরুদ্দিষ্ট মেজ-দার কথা স্মরণ করিয়া তারই দুইবিন্দু চোখের কোণে জমিয়া উঠিল। তাহার গলার হারের লকেটে মেজ-দার যে ছোট ছবিটি ছিল তাহাই বারম্বার কপালে ঠেকাইয়া বলিল,—তুমি যেন ভালো থাকো, তুমি যেন ভালো থাকো। বাংলার দুর্দ্দান্ত বিপ্লবী দলের রাণী আজ অতি সাধারণ মেয়ের মতো তার মেজ-দার দেহের কল্যাণই কামনা করিয়া বসিল।

দুর্ব্বলতাকে সে শুধু বিদ্রূপ নয়, ভয়ও করিয়া আসিয়াছে। তাই নিজের মধ্যে কোথাও দুর্ব্বলতা দেখিলে সে যেন নিজের 'পরে প্রতিশোধ লইবার জন্য দ্বিগুণ কঠোর হইয়াছে। এমন কঠোর হইয়াছে যে, তত কঠোর হওয়া পুরুষেরও মানায় না। তার মনে পড়িল, তার অতি কঠোরতায় মেজ-দা মৃদু মৃদু হাসিতেন, কিন্তু মুখে কিছু বলিতেন না। মেজ-দার হাসি দেখিয়া সে রাগই করিত।

অতীত স্মৃতি লইয়া নাড়া-চাড়া করিতে-করিতে মেজ-দার এই হাসি তার চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিল। সে একেবারে

মুঠা বন্ধ করিয়া সোজা হইয়া বসিল। উপেক্ষা সে কথনো সহিতে পারে না,—সস্নেহ উপেক্ষাও না।

নিজের ঘর হইতে সটান সভাগৃহে গিয়া সকলকে ডাক দিল।

সবাই তথন উপরে বসিয়া তারই সম্বন্ধে অপ্রীতিকর আলোচনা করিতেছিল। যে-বিমল সমীরণের মতের বিরুদ্ধে একরূপ জোর করিয়াই মক্ষিকে নেত্রীপদে অধিষ্ঠিত করে, কি-জানি কেন, সেই সব চেয়ে বেশী ক্রুদ্ধ হইয়াছে। কতকটা বিমলের বক্তৃতায় এবং কতকটা মক্ষির প্রতি বিতৃষ্ণায় স্থির হইল, অতঃপর পণ্ডিত মহাশয়কেই নেতৃপদে অভিষিক্ত করা হইবে।

কিন্তু পণ্ডিত মহাশয়ের কি-একটা আপত্তি ছিল। তিনি বিমলের নাম প্রস্তাব করিলেন। বিমল একটু ইতস্তত করিয়া শেষ পর্য্যন্ত রাজিই হইল।

এমন সময় মক্ষির ডাক আসিল। প্রথমটা সবাই গুম হইয়া বসিয়া রহিল। তারপরে কথন যে একে-একে সকলেই সভাগৃহে উপস্থিত হইল তাহা নিজেরাই জানিতে পারিল না।

কিন্তু এত কথা মক্ষি জানিত না। এ সমস্ত সংবাদ রাখিবার কোনো প্রবৃত্তিও তার ছিল না, এবং এতগুলি লোক

যে ভিতরে-ভিতরে তার বিরুদ্ধে উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে সে সন্দেহও তার মনে আসে নাই।

প্রথমে সে সমীরণকে প্রশ্ন করিল,—কত ছেলে তুমি সংগ্রহ কোরেছ তার একটা হিসাব এখন দিতে পারো?

—প্রায় তিন শো।

—প্রায় তিন শো।—তারপরে বিমলের দিকে চাহিয়া বলিল—তোমার আয়োজন কি রকম?

বিমল বলিল,—এখনই হিসাব দেওয়া মুস্কিল।

তার পানে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া মক্ষি কি-যেন একটু ভাবিল, তারপর বলিল,—আজ দু'পুরে সে হিসাব আমার চাই। আচ্ছা, এই তিন শো ছেলে নিয়ে আর তোমার যা আয়োজন আছে তার সাহায্যে তুমি কি কাজ করতে পারো?

বিমল চুপ করিয়া রহিল।

মক্ষি আবার বলিল,—মনে কর, যদি তোমার ওপরই ভার দেওয়া হয়?

বিমল বীরদর্পে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল,—এই সৈন্যদল নিয়ে আমি সম্মুখ যুদ্ধ পর্য্যন্ত করতে পারি।

সমীরণ বিস্মিত ভাবে বলিল,—সম্মুখ যুদ্ধ?

সমীরণের পরিহাসে বিমল ক্রোধে আত্মহারা হইল, বলিল,—হ্যাঁ, সম্মুখ যুদ্ধ। তুমি যা পারো না, তা অনেকে

পারে, যারা মরণের ভয় রাখে না। আমরা চাঁদের আলোর স্বপ্ন দেখিনে; রক্তের সমুদ্রে সাঁতার দেওয়া ছাড়া আর কোনো কামনা আমাদের নেই।

বিমল হাঁপাইতে লাগিল। তারপর নিজেকে শান্ত করিয়া বলিল,—সম্মুখ যুদ্ধ মানে, গরিলা যুদ্ধই আমি মনে করেছি। ইংরাজের কামান-বন্দুক-এরোপ্লেনের বিরুদ্ধে সামনা-সামনি যুদ্ধ করতে চাইব এমন বোকা আমি নই, যদিও তাও আমি পারি।

মক্ষি বলিল,—এ সম্বন্ধে তোমার কোনো পাকা স্কীম আছে?

—আছে।

—আচ্ছা, আজ সন্ধ্যেয় ছাদের ওপর আবার আমাদের সভা বসবে, সেইখানে তোমার স্কীম নিয়ে আলোচনা করা হবে।

তারপর পণ্ডিত মহাশয়ের পানে চাহিয়া বলিল,—পণ্ডিত মশাই, আপনার কি মত?

পণ্ডিত মহাশয় কোনো মতই জানাইলেন না।

মক্ষি সমীরণের দিকে চাহিয়া তাহাকে কিছু বলিবার ইঙ্গিত করিল।

সমীরণ বলিল,—ইংরাজের সঙ্গে সম্মুখে অথবা পশ্চাতে

কোনোদিন সত্যিকার যুদ্ধ হবে এ কথা আমি ভাবিও নি। এ দেশ পরাধীন অবস্থায় কোনোদিন তার যোগ্য হবে না। আমি যা ভেবেছি সে এই যে, আমাদের সংগৃহীত অস্ত্র নিয়ে শুধু ইংরাজকে ভয় দেখাবো, দেশে একটা অশান্তি সৃষ্টি করবো, যেখানে পাবো সরকারী তহবিল লুঠ করে শাসন-যন্ত্র অচল কোরে তুলব।

পণ্ডিত মহাশয় টিপ্পনী কাটিলেন,—এবং তারপরে দোষী-নির্দ্দোষ নির্ব্বিশেষে সবার ওপর এমন অত্যাচার হবে যাতে কোরে দেশের প্রত্যেকের জীবন দুর্ব্বহ হোয়ে উঠবে এবং তাদের সমবেত অভিশাপে দেশের নামে গঠিত এই প্রতিষ্ঠানটি দু'দিনে শূন্যে মিলিয়ে যাবে।

সশস্ত্র বিপ্লবে আন্তরিক শ্রদ্ধা আছে। সে উত্তেজিত ভাবে বলিল,—তাহোলে তো বিপ্লব আন্দোলন করাই চলে না।

পণ্ডিত মহাশয় হাসিয়া বলিলেন,—চলেই না তো। মেজ-দা চলে গেলেন, কিন্তু শুধু এই কথাটা বোঝাবার জন্যে আজও আমি রয়ে গেলাম।

তীরের বেগে দাঁড়াইয়া সমীরণ বলিল,—আপনি তাহোলে এ পথ সমর্থন করেন না?

পণ্ডিত মহাশয় তেমনি হাসিয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, —না, ভাই, না। আমি এ পথ বিশ্বাসই করি না।

চক্ষের পলকে বিমলের রিভলভার তাঁর মাথার দিকে উঁচু হইয়া উঠিল।

মক্ষি ইঙ্গিতে তাহাকে বসিতে বলিল।

পণ্ডিত মহাশয় বলিতে লাগিলেন,—ভয় দেখাতে চাও দেখাও, কিন্তু তোমরা তো জানো, আমি ওতে ভয় পাই নে। পেলে এ পথ মাড়াতাম না। আমি উঠলাম। কিন্তু আজ সমস্ত দুপুর ভেবে দেখে তবে ইতিকর্ত্তব্য স্থির কোরো।

পণ্ডিত মহাশয় উঠিয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন। সভা নিস্তব্ধ।

এবং সে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া মক্ষি আদেশ দিল,—এখন এই থাক। সন্ধ্যের সময় আবার সভা বসবে। সে সভায় পণ্ডিত মশায়েরও থাকা প্রয়োজন। তিনি যেন বাইরে না যান।

কিন্তু বাহিরে যাওয়ারই প্রয়োজন হইল, শুধু তাঁর নয়, সকলেরই।

ঠিক সূর্য্যাস্ত বেলার কাছাকাছি সংবাদ আসিল, পুলিশ কাল ভোরেই বাড়ী ঘেরাও করিবে।

সংবাদটি এতই আকস্মিক যে, পণ্ডিত মহাশয় হইতে আরম্ভ করিয়া সকলেরই মুখ শুকাইয়া উঠিল। ঘটনা এমন

কিছু নয়। ধরা পড়িবার সম্ভাবনা এবং তাহার পরের প্রক্রিয়াগুলির জন্য সকলেই বরাবর অল্প-বিস্তর প্রস্তুতই ছিল। কিন্তু আজই যে তাহারা ধরা পড়িতে পারে এই কথাটিই বোধ হয় কেহ ভাবে নাই।

কাল সকালে ঘেরাও করিলেও এখন হইতেই পুলিসে বাড়ীটির উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতেছে। আগে হইতেই সমস্ত ব্যাপার তাহারা জানিতে পারিয়াছে, বাহিরে তাহার কোনো লক্ষণ দেখাইলে চলিবে না।

স্থির হইল, ছোটদের এক-এক করিয়া বাহিরে পাঠাইয়া দেওয়া হইবে। তারপরে সময় থাকে বড়রা পলাইবে। নতুবা এইখানেই একটা খণ্ডযুদ্ধ হইয়া যাইবে। জয়-পরাজয় যাহা কপালে আছে তাহাই হইবে।

যাওয়ার সময় বসন্তটা বড় কাঁদিল। তথাপি তাহাকে যাইতেই হইল। সকলেরই বুক অজানা আশঙ্কায় দুরু-দুরু করিতেছিল। ভালো করিয়া বিদায় দিবার এবং বিদায় লইবার মতো মনের অবস্থা কাহারও নয়।

রাত্রি ন'টার সময় যখন জানা গেল, ছেলেরা নির্ব্বিঘ্নে স্ব-স্ব গন্তব্য স্থানে পৌঁছিয়াছে, তখন সকলেই একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিল। আর জন দশেক বাকী রহিল, এইবারে তাহাদের ব্যবস্থা নির্দ্ধারণ করা হইবে।

বন্ধনী

অস্ত্রশস্ত্র, গুলি-বারুদ যেখানে আছে সেখান হইতে বাহির করিতে পুলিশের দশ বৎসর লাগিবে। সেগুলি সেইখানেই রহিল। সকলে কেবল আত্মরক্ষার উপযোগী অস্ত্রশস্ত্র নিজের-নিজের কাছে রাখিল। স্থির হইল, এইবারে তাহারা নিজেরা পলায়নের পথ দেখিবে।

পথ আর নূতন কিছু নয়। পাশের বাড়ীগুলির ছাদের উপর দিয়া ও-রাস্তায় পড়িতে হইবে এবং সেখান হইতে ট্যাক্সি করিয়া সটান হাওড়া ষ্টেশন।

রাত তখন একটা।

এমন সময় বাহিরের দরজায় কে কড়া নাড়িল। বারান্দা দিয়া উঁকি মারিয়া বিমল দেখিল,—সুমুখের দিকটা লাল পাগড়ী মাথায় পুলিশ গিস্ গিস্ করিতেছে। আগে হইতেই উহারা বোধ করি ব্যাপারটার আঁচ পাইয়াছিল।

ঘরের মধ্যে যাহারা পলায়নের আয়োজন করিতেছিল একমুহূর্ত্তে তাহারা স্তব্ধ হইয়া গেল।

পুলিশ নীচে তখন কড়া নাড়া ছাড়িয়া দিয়া দরজা ভাঙ্গিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছে।

এদিকে নিশ্চিত মৃত্যুর সম্মুখে দাঁড়াইয়া এই কয়টি লোকের রূপ একেবারে বদলাইয়া গেল।

কেহ না বলিলেও বোঝা গেল, যুদ্ধ ছাড়া উপায় নাই

এবং পাঁচজনকে বাঁচাইতে হইলে আর পাঁচজনকে মরিতেই হইবে। নহিলে কাহারও নিষ্কৃতি নাই।

এক মুহূর্ত্তে সকলের চোখে ধক্ ধক্ করিয়া আগুন জ্বলিয়া উঠিল। এবং নিশ্চিত মৃত্যুর সম্মুখে দাঁড়াইয়া বিমল যে কাণ্ড করিয়া বসিল তাহা কেহ স্বপ্নেও ভাবিতে পারে নাই।

অকস্মাৎ মক্ষির একখানা হাত তার আবেগ-কম্পিত করতলে গ্রহণ করিয়া সে বলিল,—এই নিশ্চিত মৃত্যুর পূর্ব্বাহ্নে একটা চুমু দেবে মক্ষি,—একটি মাত্র? আমি জানি—

কিন্তু কি যে সে জানে তাহা আর শেষ করিল না। বোধ হয়, সমীরণের প্রতি মক্ষির প্রেমের কথাই বলিতে যাইতেছিল। তার স্পর্শে মক্ষির চোখের আগুন মলিন হইয়া গেল, তার সমস্ত দেহ মার্ব্বেলের মতো ঠাণ্ডা হইয়া উঠিল, এবং বিমল যেন একটা মর্ম্মর মূর্ত্তিকে গভীর আবেগে আলিঙ্গন করিয়া সকলের চোখের সুমুখে সেই পাণ্ডুর, মৃতের মত শীতল ওষ্ঠে, কপোলে এবং ললাটে উপর্য্যুপরি কয়েকটা উত্তপ্ত চুম্বন আঁকিয়া দিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। রহিল কেবল সমীরণ এবং বিপ্লবীদলের রাণীর অসাড়, নিস্পন্দ দেহ।

মুহূর্ত্তের মধ্যে নীচে গুড়ুম গুড়ুম গুড়ুম আওয়াজ উঠিল এবং বহু কণ্ঠের চীৎকারে ও ধোঁয়ায় নিশীথ রাত্রির রূপ কদর্য্য হইয়া উঠিল।

আর এক মিনিট অপেক্ষা করা চলে না। সমীরণের চোখ দুইটা বাঘের মতো জ্বলিয়া উঠিল। চক্ষের পলকে সে মক্ষির দেহ দুই বাহুর মধ্যে তুলিয়া লইয়া পাশের বাড়ীর ছাদে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজেও লাফাইয়া পড়িল।

নীচে তখনও চলিতেছে—গুড়ুম, গুড়ুম, গুড়ুম।

মাটিতে আঘাত পাইয়া মক্ষি যেন সচেতন হইল।

ত্বরিতে দাঁড়াইয়া উঠিয়া দু'জনে পর-পর গোটা কয়েক বাড়ীর ছাদে কোথাও লাফাইয়া উঠিয়া, কোথাও লাফ দিয়া পড়িয়া ও-রাস্তায় পৌছিতেই সুমুখে পুলিশ।

সে বেচারী গলির মোড়ে লাঠিতে ভর দিয়া ঝিমাইতেছিল। লাফ দেওয়ার শব্দ পাইয়াই ছুটিয়া সেই অন্ধকার গলির মধ্যে উপস্থিত হইল।

মক্ষি রিভলভার বাহির করিতে-না-করিতে সমীরণ পুলিশটার রগ ঘেঁসিয়া এমন একটা ঘুঁসি মারিল যে, কোনো শব্দ করিবার পূর্ব্বেই গোটা দুই পাক খাইয়া সে মাটিতে লুটাইয়া পড়িল। বেচারা এই অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত ছিল না।

এই অবসরে তাহারা ছুটিয়া বড় রাস্তায় পড়িল এবং একখানা ট্যাক্সি করিয়া সটান সহরের বাহিরের একটা ষ্টেশনে দৌড় দিল।

ট্যাক্সি বিদায় করিয়া দু'জনে ষ্টেশনের বাহিরে অন্ধকারে বসিয়া-বসিয়া কতক্ষণ প্রহর গণিল কে জানে, তার পরে টিকিটের ঘণ্টা বাজিল।

বহুদূরের একটা ষ্টেশনের টিকিট কিনিয়া দু'জনে যখন গাড়ীতে উঠিল তখন দেহ যেন আর বয় না।

চাঁদের আলোয় কোথাও উন্মুক্ত প্রান্তরের উপর দিয়া, কোথাও জঙ্গলের মধ্য দিয়া, কোথাও টানেলের অন্ধকার ভেদ করিয়া ট্রেণ চলিল। এ চাঁদের আলো তাহাদের চোখে পরিচিত মনে হইল না। এমন জ্যোৎস্না তাহারা যেন কখনও দেখে নাই। এ যেন এ পৃথিবীর নয়।

এ কোন্ মৃত্যু-জগতের মধ্য দিয়া মৃতের জীবন যাপন করিতে চলিয়াছে তাহারা!

ট্রেণ চলিয়াছে—

ভোর হইল।

কিছু পরে বেলা বাড়িল।

দু'ধারে লাল প্রস্তরাকীর্ণ মাঠ। তারই উপর অপরিচিত জগতের ততোধিক অপরিচিত মধ্যাহ্ন—তীব্র, রুক্ষ, নিষ্ঠুর।

গাড়ী দুলিয়া-দুলিয়া চলে। তারই সঙ্গে তাদের চিত্তও অভিনব আশঙ্কায় দুলিয়া-দুলিয়া ওঠে।

মাঝে মাঝে গাড়ী-বদলও করিতে হয়।

নূতন ট্রেণ আবার তাহাদের নূতন লোকে বহিয়া লইয়া চলে।

তখনও তাহাদের কানে বাজিতেছে গুড়ুম, গুড়ুম, গুড়ুম। মনে হয়, তাহাদেরই পাশে-পাশে সমান্তরালভাবে সেই কয়টি মৃত্যু-পথযাত্রীর গাড়ীও চলিয়াছে। দুইটা গাড়ী কোথায় মিলিবে কে জানে!

চোখের সম্মুখে ধূলিম্লান অপরাহ্ন। এ জগতে যেন কিছুই স্পষ্ট করিয়া দেখা যায় না,—সবই ঝাপ্‌সা।

গভীর রাত্রে একটা ষ্টেসনে তাহারা হঠাৎ নামিয়া পড়িল। ছোট ষ্টেশন; দু'ধারে ঘন অরণ্য চাঁদের আলোয় মৃত্যুর দিকে হাতছানি দিয়া পথিককে ডাকে।

বন্ধনী

সেই অরণ্যের মধ্য দিয়া দু'জনে নিঃশব্দে পথ চলিল।

পাহাড়ে পথ; ক্রমাগত আকাশের দিকে চলিয়াছে। নীচে দু'পাশে নিবিড় বন।

রাত্রি কত কেহ জানে না। কত পথ যে আরও বাকী আছে তাহাও অজ্ঞাত।

দূরে কোথাও পাহাড়ের উপর, কোথাও নীচু জমিতে মাঝে-মাঝে আগুন জ্বলিতেছে। লোক দেখা যায় না, শুধু আগুনের শিখাই নজরে পড়ে। পথ চলিতে-চলিতে দুটি মুসাফের চাহিয়া-চাহিয়া দেখে। কিসের আগুন বুঝিতে পারে না। দিকে-দিকে এত আগুন কাহারা ছড়াইল জানিতে ইচ্ছা হয়।

চারিদিকে শব্দ ওঠে খট্, খট্, খট্। কাঠুরিয়ার কাঠ কাটার শব্দ।

ইহারা অবাক হইয়া ভাবে, এই নিস্তব্ধ রাত্রে ইহারা কি সকলের অগোচরে পৃথিবীটাকে রাতারাতি ভাঙ্গিয়া ফেলিতে চাহে?

মাঝে-মাঝে ওদিক হইতে কাহারা যেন ডাক দেয়। এদিক হইতে তাহার সাড়া যায়। আবার এদিক হইতে ডাকে, ওদিক হইতে সাড়া আসে। যেন বলিতে চায়, ভয় নাই, এখনও বাঁচিয়া আছি, বাঁচিয়া আছি।

ইহাদের ইচ্ছা হয়, ইহারাও সে ডাকের সাড়া দেয়, জানায় যে, ইহারাও বাঁচিয়া আছে।

কিন্তু সাড়া দিতে পারে না, কণ্ঠে স্বর ফোটে না।

শুধু নিঃশব্দে পথ চলে।

পাহাড়ের চূড়ায় যখন পৌঁছিল তখন ভোর হওয়ার বেশী দেরী নাই।

একখণ্ড পাথরের উপর সমীরণ বসিয়া পড়িল।

মক্ষির দেহ তখন ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। তার চোখে যেন কোন্ স্বপ্নলোকের শ্রান্তি। চিরটা কাল সে নারীর স্নায়ু পুরুষের ধনুকে যোজনা করিয়া পুরুষেরও আগে দাঁড়াইয়া কেবলি টঙ্কার দিয়া ফিরিয়াছে। জ্যা-মুক্ত হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে সে বুঝিল, তাহার স্নায়ুতে কতটা টান বাজিয়াছে। দেহ পুরুষের মতো বলিষ্ঠ, সাহস অপার, কর্ম্মশক্তি প্রচুর; কিন্তু অত সূক্ষ্ম স্নায়ু, অত বেশী টান সহিতে পারে না। সে একেবারে এলাইয়া পড়িল।

নিজের অসীম শ্রান্তির মধ্যেই সমীরণ তার শ্রান্ত দেহ কোলের উপর তুলিয়া লইল। মক্ষি বাধা দিল না, একবার সেই পাণ্ডুর, দুর্ব্বল চন্দ্রালোকের পানে চাহিয়া চোখ বন্ধ করিল।

সমীরণ অঞ্চল দিয়া তার কপালের ঘাম মুছাইয়া দিল, নিজের কপালের ঘামও ক্লান্তভাবে মুছিল। তারও শরীর ঢলিয়া পড়িতেছিল। সেদিন সমস্ত দিন-রাত্রি এবং পূর্ব্বদিনের সমস্ত রাত্রি সম্পূর্ণ অনাহারে কটিয়াছে। কিন্তু ক্ষুধা তৃষ্ণার চিহ্নমাত্র ছিল না। ট্রেণে কামরার এক কোণে চোখ বুজিয়া সেই যে মক্ষি বসিয়াছিল আর চোখ মেলে নাই। কোথাও সম্পূর্ণ ঠেসাঠেসি, কোথাও সম্পূর্ণ নির্জ্জন কামরা, কিন্তু কেহ কাহারো সহিত একটা কথাও কহে নাই। ষ্টেশনের পর ষ্টেশন আসিয়াছে, আবার অদৃশ্য হইয়া গেছে। কিন্তু সমীরণ সেই যে জানালার বাহিরে সুমুখের দিগন্তপ্রসারিত মাঠ ও বনানীর পানে চাহিয়া একধারে বসিয়াছিল তারপর মাঝে-মাঝে ট্রেণ-বদলের সময় ছাড়া আর একবারও ওঠে নাই, চোখের পাতা একবারও বুজিয়াছিল কিনা তাহাও মনে করিতে পারে না। তার চোখ জ্বালা করিতেছিল, পিছনের একটা পাথরে ঠেসান দিয়া সেও ঢুলিয়া পড়িল।

যখন তন্দ্রা ছুটিল, তখন সবে সূর্য্য উঠিতেছিল।

তার মনে হইল, এতক্ষণে কাল-রাত্রির অবসান হইল বুঝি। ওই বুঝি নবজীবনের সূর্য্য উঠিল।

এই নবপ্রভাতের সম্মুখে তার কেমন লোভ হইল. অতি ধীরে মক্ষির মসৃণ ললাটে একটি চুম্বন দিল।

সে চুম্বনে মক্ষি জাগিয়া উঠিয়া বড়-বড় চোখ মেলিয়া চাহিল। একবার পাশ ফিরিয়া শুইবার চেষ্টা করিল। পরক্ষণেই পূর্ব্বাকাশের পানে চাহিয়া যেন নিজের মনেই বলিল,—এতক্ষণে ভোর হোল ?

তার কথার পুনরাবৃত্তি করিয়া সমীরণ বলিল,—এতক্ষণে ভোর হোল।

দু'জনেই কিছুক্ষণ সূর্য্যোদয়ের পানে নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল।

মক্ষি বলিল,—তোমার কোলে শুয়ে আরও একটু ঘুমুবো ?

—আরও ঘুমুবে ? এবারে কি—

মক্ষি তার দিকে ফিরিয়া চিরকালের নারীর মতো দুটি বাহু দিয়া তার কটি বেষ্টন করিয়া বলিল,—না, ঘুম নয়। আর ঘুম আসবে না। তোমার কোলে শুয়ে আমার আরও একটু যেন বিশ্রাম চাই।

মক্ষির চোখ বন্ধ হইয়া আসিল। তার মুখে তখনও অনশনখিন্ন ব্রতচারিণীর পাণ্ডুরতা। সে সুষমার পানে সমীরণ মুগ্ধ চোখে নির্নিমেষে চাহিয়া রহিল।

নিশিভোর

অবশেষে কাল-রাত্রির অবসান হইল।

আরও কিছুদিন কখনও বনে-জঙ্গলে, কখনও লোকালয়ে ঘোরাঘুরির পর মধ্যপ্রদেশের একটা ছোট সহরে তাহারা বাসা বাঁধিল।

কলিকাতার খণ্ড যুদ্ধে বিমল, পণ্ডিত মহাশয় প্রভৃতি সকলেই, কেহ পুলিশের গুলিতে, কেহ বা আত্মহত্যা করিয়া মানুষের বিচারের হাত হইতে অব্যাহতি পায়। কেবল একজনকে গুরুতর আহত অবস্থায় পুলিশে গ্রেপ্তার করে এবং তাহারই বিকারের টুকরা-টুকরা উক্তি হইতে প্রথমে পাঁচজনকে, তারপরে আরও বিশজনকে গ্রেপ্তার করে।

এই পঁচিশ জনেরই তখন বিচার চলিতেছিল। এবং প্রতিদিন সংবাদপত্রে সরকারী সাক্ষীর মুখে এমন-এমন রহস্য প্রকাশিত হইতেছিল যাহা বিপ্লবীদলের কেহ কখনো কল্পনাও করে নাই।

এমান অবস্থায় সমীরণ ও মক্ষি বাসা বাঁধিল মধ্য-প্রদেশের একটা ছোট সহরে।

বাজারের মধ্যে খাপড়ার একখানি ছোট বাড়ী। বাহিরের ঘরে একখানি কাপড়ের দোকান, সেখানে থাকে সমীরণ, আর ভিতরে রান্নাঘরে থাকে মক্ষি,—রাঁধে, বাড়ে, খায়।

তাম্রকূট সেবনের লোভে পুলিশগুলি মাঝে-মাঝে আসে। সমীরণ পরম সমাদরে বাহিরে গোটা কয়েক টুল পাতিয়া তাহাদের বসায়, 'তামাকু' সেবন করায় এবং নানাবিধ সুখ-দুঃখের গল্প করে।

মাঝে মাঝে সন্ধ্যার পরে বড় দারোগাবাবুও আসেন। মারাঠার দেশে বহু মারাঠার ভিড়ের ভিতর দিয়া এই বাঙালীটি কেমন করিয়া এত বড় পদ পাইলেন এই প্রায়-নিরক্ষর, নবাগত বাঙালীটিকে তাহা প্রায়ই বুঝাইয়া দেন।

এত বড়-বড় কথা যেন ঠিক বুঝিতে পারিতেছে না এমনি ভাবে সমীরণ হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকে। আর তার বিস্ফারিত চোখের সুমুখে বড় দারোগাবাবু ভুঁড়ি দুলাইয়া-দুলাইয়া ফিলজফি হইতে কেমিষ্ট্রি পর্য্যন্ত সমস্ত শাস্ত্রের আদ্যশ্রাদ্ধ করিয়া চলেন।

কথার মাঝে সমীরণ বলে,—তবেই দেখুন বড়বাবু, আপনারা এল-এ, বি-এ পাশ, তাও চাকরী পেতে কত কষ্ট। আর আমরা মুরুক্ষু-সুরুক্ষু মানুষ, আমাদের তো —হেঁঃ হেঁঃ—সমীরণ বোকার মতো দাঁত বাহির করিয়া হাসে।

বড় দারোগাবাবু ভারিক্কি চালে মাথা নাড়েন।

সমীরণ তাঁহার করুণা উদ্রিক্ত করিয়া বলে,—দেশে আর ভাত মিললো না বড়বাবু। ভাবলাম, মিথ্যে পড়ে-পড়ে উপোষ কোরে লাভ নেই। মেটে ঘরের মায়া না কোরে দিলাম 'জয় দুর্গা' বলে পাড়ি। কোনো রকমে এই কাপড়ের দোকানখানি তো কোরেছি, গহনা-পত্তর যা ছিল সব বিক্রী কোরে। এটি যদি যায় তাহোলেই তো—

সমীরণ হাতের তালু উল্‌টাইয়া অদৃষ্টের স্বরূপ বর্ণনা করে।

—সেই তো মুস্কিল হে। তা, তুমি কি মেয়েছেলে সব নিয়েই এসেছ?

বড়বাবু জানালার ফাঁক দিয়া ভিতরের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবার চেষ্টা করেন।

সমীরণ দাঁত বাহির করিয়া বলে,—কাজেই। সেদিকেও সব সাবাড় কিনা। ন মাতা, ন পিতা, কেউ কোথাও নেই,—হেঁঃ হেঁঃ—

বড়বাবু করুণা-মাখানো গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে বলেন,—তাই তো হে, গোপাল—

সমীরণ নিজের কথা পাল্‌টাইয়া দিয়া আবার বড়বাবুর প্রসঙ্গ আনে।

বড়বাবু বলেন,—আমারও এ ছাই আর ভালো লাগে না। কেবল একে ধরো, ওকে মারো, এসব আমি পারিও না, করিও না। কিন্তু চাকরী তো রাখতে হবে? না, কি বল?

সমীরণ আবার এক কলিকা তামাক সাজিয়া আনিয়া বলে,—কি যে বলেন বড়বাবু, আপনাদের তো সুখের চাকরী; রাজার মতো আছেন। এমন চাকরী ছাড়ে?

বড়বাবু উৎফুল্ল হইয়া বলেন,—তা ঠিক।

পরক্ষণেই গলা নামাইয়া বলেন,—তবে কি জানো? দিন-কাল বড় খারাপ পড়েছে। ছোঁড়াগুলো গোলা-গুলি নিয়ে ক্ষেপে দাঁড়িয়েছে। চাকরী তো বেশ ভালোই ছিল, তারাই যত গোল পাকিয়েছে। তাও বলি, তোদের বাপু,—

বড়বাবুর মুখের কথা লুফিয়া লইয়া সমীরণ বলে,—এই কথা, বড়বাবু। চাল আক্রা, ডাল আক্রা, তার মধ্যে তোরা আবার ঝঞ্ঝাট বাড়াস কেন বাবা। লেখাপড়া

শিখছিস শেখ, না শিখছিস নেই নেই,—চাকরী-বাকরী দেখ, বাপ-মায়ের দুঃখু দূর কর। তা নয়—

সমীরণের সরলতায় বড়বাবু হো হো করিয়া হাসিয়া ওঠেন। বলেন, ওহে গোপাল, সবাই যদি তোমার মতো হ'ত তাহোলে আর ভাবনা ছিল কোথায়? কিন্তু তাও বলি, তোমার ওপরও প্রথমে নজর পড়েছিল। আমারই ওপর তো ভার। আমি তোমাকে দেখেই বুঝলাম,—হুঁ হুঁ বাবা, এই করতে-করতে পঞ্চাশ বছর পার করলাম।

তারপরে গলার স্বরে গাম্ভীর্য্য আনিয়া কহিলেন,—তোমাকে একটা জিনিষ শিখিয়ে দিই। যার নাক দেখবে বড়, একেবারে ঠোঁটের ওপর ঝুলে পড়েছে তার সঙ্গে মিশবে না—কদাপি না—

বলিয়া টুলটার উপর নড়িয়া-চড়িয়া বসিলেন।

—কলকাতায় যারা ধরা পড়েছে তাদের দেখে এলাম কি না,—প্রত্যেকের নাক বড়, আর ইয়া-ইয়া গোঁপ,—যেন এক-একটা ডাকাত।

হাওয়া লাগিয়া জানালায় খুট করিয়া একটু শব্দ হইতেই বড়বাবু সেদিকে একবার আড়চোখে তাকাইয়া লইলেন এবং কলিকাতার ডাকাতদলের কথা ভুলিয়া গিয়া কহিলেন,—বড় নাকওয়ালা লোক, বুঝেছ,—

ীরণ সাগ্রহে বলিল,—ও আর বলতে হবে না, বড়বাবু। বড় নাকওয়ালা লোককে আমি আর চৌকাঠ মাড়াতে দিচ্ছি নে। কাপড় কিনতে চাও, বাইরে বোসো, কাপড় কেনো, নগদ দামটি ফেলে দাও—ব্যস।

বলিয়া চট্ করিয়া একখানি ছোট ডুরে শাড়ী বাহির করিয়া সেখানিকে অতি যত্নে ভাঁজ করিয়া বড়বাবুর হাতে দিল।

—এখানি মা লক্ষ্মীর জন্তেই আনানো। ক'দিন থেকেই ভাবছি, পাঠিয়ে দোব। তা আজ যখন আপনি নিজেই এলেন—

বড়বাবু ঈষৎ একটু আপত্তি জানাইতেই সমীরণ একেবারে তাহাকে বাধা দিয়া কহিল,—আজ্ঞে না, আপত্তি করতে পাবেন না। আমার মা-লক্ষ্মীকে আমি যা-খুশী তাই দোব, তাতে আপনার আপত্তির কি আছে বলুন তো?

বড়বাবু যেন অপ্রস্তুত হইয়া গেলেন, এমনিভাবে হাসিলেন।

অকস্মাৎ সমীরণের দুই চোখ ছল্ ছল্ করিয়া উঠিল। সে বাষ্পগদগদ কণ্ঠে কহিল,—দিই কি সাধে বড়বাবু? দেশে আমার একটা ভাইঝি আছে, অবিকল অমনি,—অমনি গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে কুট্ কুট্ কোরে কথা বলে।

সমীরণ কাপড়ের খুঁটে চোখ মুছিল।

এ অশ্রুতে বুড়ারও চোখে জল আসিল। তিনি যেন লজ্জিত হইয়া বলিলেন,—না, না, নোব না কেন, নোব না কেন। কি জান, পুলিশের লোক, একটুতেই—বুঝলে না?

বড়বাবু এইবার আস্তে আস্তে উঠিলেন। সমীরণ তাঁহাকে সিঁড়ি পর্য্যন্ত আগাইয়া দিল। সিঁড়ির কাছে আসিয়া জোড় হস্তে বলিল,—আর একটি নিবেদন ছিল, বড়বাবু।

—কি?

—এই দোকানটির ওপর একটু কৃপা-দৃষ্টি রাখবেন। বিক্রী-সিক্রি তো তেমন—

বড়বাবু বাইসিকেলে চড়িয়া চলিতে-চলিতে বলিয়া গেলেন—সে হবে, সে হবে।

মক্ষি পাশের ঘরেই বসিয়াছিল। সমীরণ ঘরে ঢুকিতেই বলিল,—ফিলজফি শেষ হোল? বাবাঃ, কী গল্পই পেড়েছিলে! শেষ আর হোতে চায় না।

সমীরণ হাসিতে-হাসিতে বলিল,—তুমি বুঝি এই ঘরে বোসে?

মক্ষি চাবির রিং-বাঁধা আঁচলটা দুলাইতে দুলাইতে বলিল,—হ্যাঁ। ঘি আনতে হবে, ভাবলাম, তোমাকে বোলে আসি। এসে দেখি, ওমা, তুমি বড়বাবুর সঙ্গে আলাপে একেবারে মশ্‌গুল!

সমীরণ হাসিতে লাগিল।

মক্ষি বলিল,—আচ্ছা, অতক্ষণ ওর সঙ্গে কি কোরে আলাপ কোরছিলে তুমি? বিরক্ত লাগছিলো না?

—না, না। তুমি আমাদের বড়বাবুর নিন্দা কোরো না। বড়বাবু লোক ভালো, কেবল একটু বোকা।

সে খাটের উপর শুইয়া পড়িয়া একটা আরামের নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—আঃ!

পিঠের নীচে যে-বইখানি চাপা পড়িয়াছিল সেখানি বাঁ হাত দিয়া বাহির করিয়া সমীরণ কহিল,—ওরে বাবা, কিপলিং পড়া হচ্ছে?

মক্ষি বইখানি টানিয়া লইবার জন্য হাত বাড়াইল। বলিল—আজ্ঞে হ্যাঁ। দিন্ তো ওখানা।

যে-পাতাটি খোলা ছিল তাহারই এই ক'টি লাইন সমীরণের চোখে পড়িল,—

বন্ধনী

"Enough for me in dreams to see
And touch thy garment's hem.
Thy feet have trod so near to God
I dare not follow them."

মক্ষি বলিল,—তুমি এ সব কথা বিশ্বাস করো ?

সমীরণের চোখের তারা দুইটি কাঁপিতেছিল। একবার হাত দিয়া সে যেন ওর পা দুটি স্পর্শ করিতে চাহিল। পরক্ষণেই হাত সরাইয়া লইল, বুঝি সাহসে কুলাইল না।

মক্ষি মাথায় ঝাঁকি দিয়া বলিল,—সব বাজে, বাজে, বাজে। খালি রোমান্সের খাতিরে বড়-বড় কথা বলা। শুধু নারী ভোলাবার ছল।

সমীরণ ইহার প্রতিবাদে ব্যস্ত হইয়া কি একটা বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু মক্ষি সেদিকে না চাহিয়াই বলিতে লাগিল, —'তোমার শাড়ীর আঁচলটুকু স্বপ্নে যদি ছুঁতে পাই সেই আমার ঢের।' সেই যদি ঢের হয় তো তার পেছনে আবার কেন ছোটো ? তার দেহকে পাওয়ার লোভে কেন বিয়ের মন্ত্র পড়ো ?—মক্ষি উত্তেজিত হইয়া বলিল,—সব বাজে! আমি ওর এক বর্ণও বিশ্বাস করিনে।

সমীরণের মুখে ব্যথার চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল। তার কেমন মনে হইল, এ কথা বুঝি তাহাকেই ঠেস দিয়া বলা হইল।

বন্ধনী

সে বলিল,—কেন বিশ্বাস করো না ? এ কি মিথ্যে?

—হ্যাঁ মিথ্যে। তোমাদের সহস্র রকমের কাজ আছে, তারই ফাঁকে, বিশ্রামের অবসরে তোমরা প্রেমচর্চ্চা করো। তখন তোমরা কবিতার পেখম তুলে নারীর সুমুখে নৃত্য করো। সে নৃত্যে নারী গলে পড়ে, নিজের অজ্ঞাতসারে নিজেই কখন আত্মসমর্পণ কোরে বসে। প্রেম তোমাদের একটা বিলাস। যেমন তোমরা আফিস যাও, মোটর রাখো, হাওয়া বদলাতে সিমলা যাও, যেমন তোমরা প্রাইভেট টিউটর রাখো, তেমনি তোমরা প্রেম করো।

সমীরণ সোজা হইয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল,—তেমন নয়। আমি নিজে যে জানি, গভীর অরণ্যে আমলকী গাছের নীচে তুমি ক্লান্ত তনু আমার কোলে ঢেলে দিয়েছো, আমি সমস্ত রাত্রি পেছনের গাছে ঠেস দিয়ে জেগে কাটিয়েছি। যদি কখনও একটু তন্দ্রা এসেছে, পাতার মর্ম্মরে তখুনি চমকে জেগে উঠেছি। ভেবেছি, এই শেষ! পুলিশ এলো বোলে, আর নিষ্কৃতি নেই। তবু তোমায় স্পর্শ করতে পারিনি। শুধু মনে হ'ত, আমার অন্তিম-ক্ষণে জীবনের শেষ রাত্রিটি তোমার মাথা কোলে কোরে জাগতে পেয়েছি এই আমার ঢের। এর বেশী চাইতে আমার সাহসই হয়নি।

কথাটা ঠিক সত্য নয়। তথাপি মক্ষি লজ্জায় প্রথম দিনের ঘটনার উল্লেখ করিতে পারিল না।

সমীরণ বলিল,—এই খাটখানিতে তুমি যখন পা ঝুলিয়ে বসে থাকো, মনে হয়, তোমার পায়ের তলায় পা দু'খানি কোলে নিয়ে চুপ কোরে বসে থাকি। অনন্তকাল আমাদের ছুঁয়ে-ছুঁয়ে ঢেউ দিয়ে-দিয়ে দুলিয়ে যাক। সেই ঝুলনের দিনে আমি বলবো—

"Being your slave, what should I do but tend
Upon the hours and times of your desire?
I have no precious time at all to spend,
Nor services to do, till you require."

সমীরণের চোখ হইতে আনন্দ উছলিয়া উঠিল। বলিল,—কিন্তু তাই বা বলতে পারলাম কই? তোমার সুমুখে আমার সমস্ত ইচ্ছা মূক হোয়ে পড়ে।

আনন্দে মক্ষির চোখ দুইটা তখন বুজিয়া আসিয়াছে। মনে হইল, সে বুঝি এখুনি কাঁদিয়া ফেলিবে।

অস্ফুট স্বরে সে কোনো মতে বলিল,—কেন পার না? আমি তো কখনো বাধা দিই নি, কখনো কিছুতে 'না' বলিনি।

মক্ষি মিথ্যা বলে নাই। সমীরণকে কখনও সে বাধা দেয় নাই। সুদীর্ঘ দিন ক্রমাগত বনে-জঙ্গলে ঘুরিয়া

তার মধ্যে শ্রান্তি আসিয়াছিল। সে শ্রান্তি যেমন তার দেহকেই খিন্ন করিয়াছে তেমনি তার মনকেও সুস্নিগ্ধ করিয়াছে। এখন যেন সে একটু ছায়া চায়, যেখানে বাহুর পরে মাথা রাখিয়া বিশ্রাম করা চলে।

এই বাড়ীটা ভাড়া নিয়া সমীরণ বলিয়াছিল,—এতদিনে তোমায় পেলাম, মক্ষি।

সমীরণের এত বড় স্পর্দ্ধার উত্তরে মক্ষি একটা কথাও কহে নাই। তার ঠোঁটের কোণে বরং একটু সাহস-জাগানো হাসিই খেলিয়া গিয়াছিল।

গোধূলি ক্ষণে একান্ত নিভৃতে দুটা কথা কহিলেই পাওয়া যাইবে এমন সুলভ নারী মক্ষি নয়। তাহাকে উপেক্ষা করা চলে না, এবং মিষ্ট কথা কহিলেই কৃতার্থ হইবে এমন আশা আর যাহার কাছেই চলুক, তাহার কাছে নয়।

তথাপি সমীরণের ঔদ্ধত্য তাহাকে বিদ্ধ করে নাই। মৃদু হাসিয়া সে বরং তাহা মানিয়াই লইয়াছিল।

তার সমস্ত জীবন কেমন ওলট-পালট হইয়া গেছে। আগের সঙ্গে সে নিজেই যেন আর মিল খুঁজিয়া পায় না। ও যেন কোন্ দুস্তর মরুভূমির মধ্য দিয়া পথ হাঁটিতে হাঁটিতে মধ্য পথেই ঘুমাইয়া পড়ে। জাগিয়া উঠিয়া

দেখে, এ আবার এক নূতন লোক। মরুভূমি কোথায় মিলাইয়া গেছে, এখন তাহা স্বপ্নের মতো মনে হয়।

মাঝে-মাঝে আগের কথাও ভাবিতে চেষ্টা করে। সেই চির পুরাতন বিপ্লব-কেন্দ্র, সেই রক্ত-লোলুপ উন্মাদনা। সেখানে সে ছিল রাণী, সমস্ত লোক তার আদেশের অপেক্ষায় নতশিরে দাঁড়াইয়া থাকিত। পশ্চিমের ছোট সহরের খাপড়ার ঘরের মধ্যে বসিয়া সে বিহ্বল নেত্রে চাহিয়া থাকে, আর তার চোখের সুমুখ দিয়া তার সহকর্ম্মীদের মুখ বায়োস্কোপের ছবির মতো ভাসিয়া-ভাসিয়া মিলাইয়া যায়।

বসন্তকে তার দেখিতে বড় ইচ্ছা করে। শশকের ছানার মতো সে একটু নিরালা পাইলেই যেন তাহার হাত হইতে খাবার খাইবার লোভে কাছটিতে আসিয়া বসিত। তাহার নিষ্কলঙ্ক, সরল মুখের উপর গাঢ় করিয়া যে-কুণ্ঠার ছাপ পড়িয়াছে তাহাতে তাহার করুণা জাগিত।

বিপ্লবের একনিষ্ঠ সেবক বিমলও আর নাই, তাহার জন্যও মক্ষির চোখে দু-ফোঁটা জল জমিল।

তথাপি এই প্রসঙ্গটিই দু'জনে দু'জনের কাছে প্রাণপণে এড়াইয়া চলে। যে কেন্দ্রটিকে ঘিরিয়া এতগুলি লোক একরূপ অভিন্ন-হৃদয় হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার প্রসঙ্গে কোথায় যে কুণ্ঠা তার কারণ নির্ণয় করা কঠিন।

বন্ধনী

তাহারা দুইজন ছাড়া আর সকলেই সম্মুখ সমরে প্রাণ দিয়াছে। সেই বাঞ্ছিত মৃত্যু ছাড়িয়া কেন যে তাহারা পলায়ন করিল, কিসের লোভে তাহাদের বাঁচিবার প্রয়োজন এত বেশী হইল আজ তাহাই ভাবিতে বিস্ময় লাগে। অথচ শুধু কোনোমতে প্রাণরক্ষার জন্যই যে তাহারা পলায় নাই, তাহাদের বাঁচিয়া থাকার একটা কোনো সার্থকতা যে সেদিন মনে উঠিয়াছিল, ইহাও নিশ্চয়।

কিন্তু আজ অতীত বিপ্লবী জীবনের জের টানিয়া চলিবার কোনো প্রয়োজনই যেন ইহাদের মনে আসে না। বরঞ্চ গত জন্মের স্মৃতি তাহারা যেন সবলে মুছিয়া ফেলিতে চায়।

মাঝে-মাঝে এক-একটা কথা মনে পড়িয়া দু'জনেরই চোখের দৃষ্টি একাগ্র হইয়া ওঠে। কিন্তু পরক্ষণেই আপনাকে সম্বরণ করিয়া লয়। এবং যদিচ একের গোপন করিবার চেষ্টা অপরের চোখে ধরা পড়ে, কথাটি তথাপি গোপনই থাকিয়া যায়।

শুধু ইহাই নয়। চারিদিক দিয়াই যেন কুণ্ঠার একটা ধোঁয়াটে পর্দা দু'জনের মধ্যে সারাক্ষণ টাঙ্গানোই রহিয়াছে। উঠানে একটা খাটিয়া বিছাইয়া সমীরণ সন্ধ্যার পরে শুইয়া

থাকে। ইচ্ছা করে, তাহারই একপাশে মক্ষি আসিয়া বসে। মক্ষিরও একটু ইচ্ছা যে হয় না তা নয়। তবু পারে না, দাওয়ার উপর উঠানে পা ঝুলাইয়া সে আসিয়া বসে।

তারপরে কথা ভালো জমে না। দু'জনেরই মনের মধ্যে কি একটা কামনা কেবলি ঘোলাইয়া ওঠে। তখন একজন চিৎ হইয়া নির্ব্বিকার ভাবে খাটের উপর শুইয়া থাকে, আর একজন পায়ের বুড়া আঙ্গুল দিয়া উঠানের উপর কি যে নক্সা কাটে তাহা সেও জানে না,—তাহার আঁচল পায়ের কাছে লুটাইতে থাকে।

এমন করিয়া ক'দিন কাটে ?

পাশের বাড়ীর গোপালকৃষ্ণ ভিড়ের বৌ কয়েক বারই পাঁচীলের ওদিক হইতে আলাপ জমাইবার চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু সাহস করিয়া আলাপ করিতে পারে নাই। চোখা-চোখি হইবার উপক্রম হইতেই মুখ সরাইয়া লইয়াছে।

মক্ষিও কোনোদিন ওদিকে বড় তাকায় নাই। সেদিন কিন্তু হঠাৎ চোখোচোখি হইয়া গেল।

মেয়েটি দেখিতে মন্দ নয়। রংটি খুবই ফর্সা, কিন্তু মলিন বস্ত্রে বড় ম্লান লাগে। বয়স ষোলর বেশী নয়।

চোখে চোখ পড়িতেই মেয়েটি যেরূপ সন্ত্রস্তভাবে

সরিয়া গেল তাহাতে মক্ষি অবাক হইয়া ভাবিতে লাগিল, মেয়েটি পাগল না কি?

পরক্ষণেই আবার সেই মুখখানিকে উঁকি মারিতে দেখা গেল। এবারে মক্ষি তাহাকে হাত ইসারায় ডাকিতেই মেয়েটি আর সরিয়া গেল না, দাঁড়াইয়া-দাঁড়াইয়া কুণ্ঠিতভাবে হাসিতে লাগিল।

মক্ষি হিন্দিতে বলিল,—তোমরা কি এই বাড়ীতে থাক নাকি?

মেয়েটি ঘাড় নাড়িয়া বলিল,—হ্যাঁ।

—কই, তোমাকে তো আর কোনোদিন দেখি নি?

মেয়েটি হাসিতে লাগিল।

হাসির রকম দেখিয়া মক্ষির গা জ্বলিয়া যাইতেছিল। তথাপি এই প্রতিবেশিনীর সাহচর্য্যের উপর লোভও কম হইল না।

মক্ষি বলিল,—তুমি দুপুর বেলায় আসবে আমাদের বাড়ী?

এমন সময় একটা ভারি মেয়েলি গলায় বৌটিকে কে যেন কি প্রশ্ন করিল। বৌটিও ঘাড় ফিরাইয়া তাহার কথার উত্তর দিল। সম্ভবত বৌটি কাহার সহিত কথা কহিতেছে তাহাই জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল। কিন্তু

মারাঠি ভাষায় কথা, মক্ষি কিছুই বুঝিল না। তার মনে হইল একটা ফাঁপা লোহার গোলক একখানা করোগেট শিটের উপর দিয়া চলিয়া গেল।

মেয়েটি বলিল,—যাবো দুপুর বেলায়।

দুপুর বেলায় মেয়েটি বেড়াইতে আসিল। সঙ্গে দুটি ছেলে, একটি বছর তিনেকের আর একটি বছর দেড়েকের। দামাল ছেলে দুইটি লইয়া মেয়েটি বিব্রত হইয়া থাকে। কথা কহিতে দেয় না।

বড়টি পিছন হইতে এমন জোরে গলা টিপিয়া ধরে যে, মায়ের দম বন্ধ হইবাব মতো হয়, চোখ কপালে ওঠে। ছোটটি অতটা পারে না, সে ছোট-ছোট দুটি হাত দিয়া মায়ের অধরে থাবা মারে।

মক্ষি হাসিয়া বলিল,—বড় দুরন্ত ছেলে।

মেয়েটি হাসিয়া বড় ছেলেটিকে পিছন হইতে টানিয়া দুম্ করিয়া সুমুখের দিকে বসাইয়া দিল।

মক্ষি বলিল,—তোমার নাম কি ?

—সত্যবতী।

সত্যবতী বলিতে লাগিল,—ছেলে দুটা অত্যন্ত দুরন্ত। ইহাদের অত্যাচারে তাহার নাহিবার-খাইবার সময় নাই। বাবু তো দিন-রাত্রি দোকান লইয়া থাকে, ছেলের ঝক্কি

তাহাকে পোহাইতে হয় না। সমস্ত তাল পড়ে তাহার উপর।

বলিল,—মাগো, মানুষের আবার ছেলে হয়!

মক্ষি অবাক হইয়া তাহার মুখের পানে চাহিয়া রহিল। সত্যবতী মুখে যাহাই বলুক, ছেলে দুটি যে তাহার আনন্দের বিঘ্নস্বরূপ হইয়াছে তাহার স্মিত মুখের ভাব দেখিয়া তাহা মোটে বোঝা গেল না।

সত্যবতী হাসিয়া বলিল,—আমার শাশুড়ীর জন্যে এদের গায়ে কি কারো হাত দেবার উপায় আছে? তাই তো এমনি হয়েছে।

মক্ষি বড় ছেলেটিকে কাছে টানিয়া আনিয়া তাহার মাথার বড় বড় কোঁকড়া চুলে হাত বুলাইতে-বুলাইতে বলিল, —তুমি কি পাগল না কি? এত ছোট ছেলের গায়ে কেউ হাত তোলে? ক বছর বয়েস এর?

—তিন বছরের হোল।

কিন্তু তিন বছরের মতো লাগে না। এমন লম্বা-চওড়া, মোটা-সোটা গড়ন।

মক্ষি বিশ্বাস করিতে পারিল না। বলিল,—তোমার বয়স কত?

সত্যবতী বলিল—ষোল বছর।

মক্ষি অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল।

—তোমার কি তেরো বছরে ছেলে হয়েছিলো ?

সত্যবতী উত্তর দিল না, মুখ নামাইয়া বসিয়া রহিল।

এত অল্প বয়সে এমন স্বাস্থ্যবান সন্তানের মাতা হইতে পারা যায় এ কথা কোনো বইতে লেখা নাই। বরং মক্ষি চিরদিন শুনিয়া আসিয়াছে এবং পড়িয়া আসিয়াছে যে, অল্প বয়সের মাতার সন্তান বলিয়াই এই জাতির দেহ শীর্ণ, দৃষ্টি-শক্তি ক্ষীণ এবং পরমায়ু স্বল্প। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকেরাও ভারতবাসীর সর্ব্ববিধ দৈন্যের ইহাই মূল কারণ বলিয়া রায় দিয়াছেন।

আজ মক্ষির এই রায়ে সন্দেহ জাগিল। ষোল বছর বয়সে দুইটি সন্তানের জননী হওয়ার পরেও সত্যবতীর স্বাস্থ্য এবং দেহের গঠন অটুট আছে। ছেলে দুইটিও চারু, সুকুমার ও বলিষ্ঠ। মক্ষির কৌতূহল প্রবল হইল। একটি-একটি করিয়া নানা প্রশ্ন করিয়া বুঝিল, সত্যবতীর ছেলেরা হর্লিক্স্ খায় না, প্রচুর পরিমাণে গো-দুগ্ধ পান করে। পোষাক-পরিচ্ছদের বালাই নাই, দিনরাত্রি জামা-কাপড় পরিয়া আয়ার কোলে-কোলেও ফেরে না। ধূলায়-বালিতে সর্ব্বক্ষণ মাটি-মার স্নেহস্পর্শ লাভ করে।

মক্ষির নিজের স্বাস্থ্য ভালো। বাঙ্গালীর কুব্জপৃষ্ঠ,

ক্ষীণদৃষ্টি মেয়ের দল দেখিয়া সমগ্র মেয়ে জাতের প্রতি তার কেমন বিতৃষ্ণা জাগিয়াছিল। এই স্বাস্থ্যবতী মেয়েটিকে তার ভালোই লাগিল। কিন্তু লেখাপড়া বিশেষ জানে না।

মক্ষি বলিল,—লেখাপড়া শেখোনি কেন ?

—আমাদের মেয়েদের লেখাপড়া শিখতে নেই।

—কেন ?

সত্যবতীদের পূর্ব্বপুরুষ ভোঁসলা রাজসরকারে কি একটা বড় কাজ করিতেন। অবস্থা মলিন হইয়া আসিয়াছে বটে, কিন্তু এখনও তাহাদের বংশের কেহ সাধারণের সঙ্গে একাসনে বসে না। পাঠশালে গেলে সকলের সঙ্গে বসিতে হয় বলিয়া তাহাদের বংশের ছেলে-মেয়ে কেহ পাঠশালে যায় না। একটু-আধটু কাজ চলার মত বাড়ীতেই শিখিয়া লয়।

মক্ষি প্রশ্ন করিল,—তুমি সমস্ত দিন কি কর তবে ?

সত্যবতী হাসিয়া বলিল,—কাজের কি অন্ত আছে দিদি ? সকাল থেকে রাত দশটা পর্য্যন্ত দুই শাশুড়ী-বৌতে খেটেও কাজ শেষ করতে পারিনে। বিকেল বেলায় বসে বসে আপনি কত বই পড়েন দেখি। কিন্তু আমি যদি অমন বই পড়তে জানতাম তবুও অমন করে বই পড়বার ফুরসৎ পেতাম না,—এত আমার কাজ।

সংসারে উহাদের কয়জনই বা লোক। সত্যবতীরা স্বামী-স্ত্রী দু'জন, দুটি ছেলে আর বুড়ী শাশুড়ী। ইহাদের এমন কি কাজ থাকিতে পারে যাহাতে এক ঘণ্টা বই পড়িবারও সময় নাই? ইহাদের সংসার-যাত্রা দেখিবার জন্য মক্ষির অত্যন্ত লোভ হইল।

সে বলিল,—তোমার বাড়ী কালকে যাব, কেমন?

মেয়েটি কৃতার্থ হইয়া বলিল,—আসবেন কালকে? দুপুর বেলায় আসবেন, কেউ থাকে না সে সময়।

বেলা তখন তিনটা বাজে। ছেলে দুটিকে টানিয়া তুলিতে-তুলিতে সত্যবতী বলিল,—আজকে উঠলাম ভাই। কালকে যেন যাবেন নিশ্চয়।

বড় ছেলেটি মায়ের একটা হাত ধরিয়া আগে-আগে টানিয়া লইয়া চলিল। মক্ষি একদৃষ্টে তাহাদের চলিয়া যাওয়া দেখিতে-দেখিতে বলিল,—যাবো।

কি একটা বিশেষ কাজ থাকায় নির্দ্দিষ্ট সময়ে সমীরণ চা-পানের জন্য ভিতরে আসিতে পারে নাই। যখন আসিল তখন সন্ধ্যার বড় বেশী বাকী নাই।

কিন্তু তখনও মক্ষি সেই একভাবে ঠায় সেখানে বসিয়া আছে। তখন পর্য্যন্ত সন্ধ্যার জন্য দীপদানের আয়োজনও করা হয় নাই। তাহার কিছুই ভালো লাগিতেছিল না। দেশ ছাড়িয়া সুদূর প্রবাসে যে বাসা বাঁধিয়াছে ইহা নিতান্ত বিড়ম্বনা মনে হইতে লাগিল। ইহার যেন কোনো মানে নাই, কোনো সঙ্গতিও নাই। এই পৃথিবী, ইহার ফলে, ফুলে, তৃণে ভরা মাঠ, ইহার প্রভাত ও সন্ধ্যা, তাহার সহিতই বা তার যোগ কোথায়? যে মাটি মাথায় নিয়া বোমা ও পিস্তল হাতে কেবলই কসরৎ করিয়া বেড়াইল তাহার টানও যেন অন্তর পর্য্যন্ত পোঁছায় না।

এ পৃথিবীতে তাহার আকর্ষণ বলিতে কি-ই বা আছে? আজও মরে নাই বলিয়াই বাঁচিয়া থাকা, কেবলই একটা দুঃখের সঙ্গে আর একটা দুঃখের গিঁট বাঁধিয়া চলা।

এমন করিয়া বসিয়া থাকিতে সমীরণ মক্ষিকে কখনো দেখে নাই। চিরদিন এই বিদ্যুৎলতা আপনার তেজে ও তীব্রতায় চমক দিয়া ফিরিয়াছে। নিজে কোনো দিন ম্লান হয় নাই, যার উপর তার আলো পড়িয়াছে তাকেও চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে। ইহার কাছে গিয়া ধ্যান ভাঙ্গাইতে তার সাহসই হইল না। কি করিবে ভাবিয়া না পাইয়া সে আপন মনেই পায়চারী করিতে লাগিল।

কতক্ষণ পরে তার ধ্যান ভাঙ্গিল। প্রথমটা সে অবাক হইয়া সমীরণের চোখে চোখ রাখিয়া স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। তারপরে চেতনা ফিরিয়া আসিতেই সে কতকটা লজ্জিত হইয়াই উঠিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সামলাইয়া লইয়া বলিল,—তোমার আজ চা খেতে এত দেরী যে?

এতক্ষণে সমীরণের সাহস ফিরিয়া আসিল। সে হাসিয়া বলিল,—বড় দারোগাবাবু এসেছিলেন কি না। তাঁর কাছে কিঞ্চিৎ ফিলজফির উপদেশ নেওয়া গেল।

মক্ষিও হাসিয়া বলিল,—তাহোলে তোমার দোকান থেকে আর একখানা ডুরে শাড়ীও বিদায় হোল নিশ্চয়, তোমার মা-লক্ষ্মীর জন্যে।

সমীরণ সুমুখের খাটে বসিতে-বসিতে বলিল,—না, না, লোভের বেশী প্রশ্রয় দেওয়া ঠিক নয়। কিন্তু তোমার চা খাওয়া হ'য়ে গেছে? উনোন তো বয়ে যাচ্ছে।

বাঙ্গীটা যে কোন সময় আসিয়া উনানে আগুন দিয়া গেছে সেদিকে মক্ষির খেয়ালই হয় নাই। সে তাড়াতাড়ি বলিল,—এই মাত্র উনোন ধরলো।

চা তৈয়ারী করিয়া আনিয়া মক্ষি বলিল,—কিন্তু এমনি কোরে কতদিন আরও চলবে? তুমি কি কিছু ঠিক করেছ?

সমীরণ চিন্তিত ভাবে বলিল,—এখন কিছুদিন এমনি কোরেই চালাতে হবে বোধ হয়। তা ছাড়া আর কি কিছু উপায় আছে ?

—সে আমিও জানিনে। কিন্তু এমন কোরেও আর ভালো লাগে না। বরং—

কিন্তু কথাটা বলিতে গিয়া মুক্তি থামিয়া গেল। সে বলিতে যাইতেছিল,—বরং আমাকে রেহাই দাও। বলিতে গিয়াই মনে পড়িল তাহাকে তো কেহ বাঁধিয়া রাখে নাই। তার চারিদিকে যদি কোনো বন্ধন জমিয়া থাকে সে বন্ধন-জাল সৃষ্টি করিয়াছে সে নিজেই। ইহাতে অন্য কাহারও হাত নাই।

তথাপি অকারণেই উত্তেজিত হইয়া মক্ষি বলিল,—তুমি কেন পালিয়ে এলে ? সামনা-সামনি যুদ্ধ কোরে মরতাম সেই তো ছিল ভালো। এ কি একটা জীবন ? এমনি কোরে বাঁচা যায় ?

মক্ষির উত্তেজনায় ঈষৎ হাসিয়া সমীরণ বলিল,—তুমি আজ কেন উত্তেজিত হয়েছ জানিনে। কিন্তু পালিয়ে এলেও তোমার মরবার পথ আটকেছি এমন অপবাদ তুমি দিতে পারো না। শত্রুও পালায়নি, তোমারও রিভলভারে গুলি আছে।

বন্ধনী

—তবে আমরা কেন এমন কোরে হাত গুটিয়ে বসে থাকি? আর একবার ঝাঁপিয়ে পড়া যায় না? এখানে আমাদের কি কাজ?

একটু কি ভাবিয়া সমীরণ বলিল,—ঝাঁপিয়ে পড়া যায়। কিন্তু আমার জীবনে অন্য মোহ এসেছে। তুমি আমায় ঘৃণা করতে চাও কোরো, কিন্তু সে মোহ যে কিসের তা তুমিও জানো।

কথাটা বলিয়া ফেলিয়াই সমীরণ সশঙ্কচিত্তে একটা কড়া উত্তর আশা করিতে লাগিল। কিন্তু সেরূপ কোনো উত্তর আসিল না দেখিয়া একটু যেন সাহস পাইল।

সে বলিতে লাগিল,—তুমি বলছ, এই কি একটা জীবন! কিন্তু এই জীবনের প্রতিই আমার লোভের সীমা নেই। অথচ, কি-ই বা পেয়েছি!

একটু থামিয়া বলিল,—বিমল মরতে পেরেছিলো, কারণ তার একদিকে ছিল অতি বৃদ্ধ পৃথিবী, আর এক দিকে ছিলে অনন্ত-যৌবনা তুমি। তার প্রেমও ছিল ভীরু, দুর্ব্বল। আমি পারিনি, আমার সুমুখে ছিল শ্যামা ধরণী, আর তারই মাঝে যৌবনের নবমঞ্জরী হাতে তুমি ছিলে দাঁড়িয়ে। আমায় তাই মৃত্যুকে এড়াতে হোল। এ কি দোষের?

যে-মেয়ে নিজের হাতে কেল্লা উড়াইবার স্বপ্ন দেখে সে কিন্তু এই আলোচনার তোড়ে একেবারে এলাইয়া পড়িল। সে হঁা, না, কোনো উত্তরই দিল না।

সমীরণ বলিল,—মেজ-দা তোমার নাম রেখেছিলেন মক্ষিরাণী। মেজ-দার অন্তর্দৃষ্টি ছিল। তিনি জানতেন, আমাদের বিপ্লবদলের এতগুলো ছেলে শুধু তোমাকেই কেন্দ্র কোরে চক্র দেয়। তোমার প্রতিভা আমি অস্বীকার করিনে। বরং তোমার যে প্রতিভা আছে তা খুব কম পুরুষেরই থাকে। তবু তোমায় কেন্দ্র কোরে যে এতগুলি ছেলে ঘুরতো, সে তোমার প্রতিভার আকর্ষণে ততখানি নয় যতখানি তোমার দেহের আকর্ষণে। কথাটা খুব কুৎসিত শোনাচ্ছে, কিন্তু তোমার একটি কথায় যে-ভাবে এরা মরতে পারতো এমন বুঝি মেজ-দার কথাতেও পারতো না। তুমি বলবে, নারীকে যে তোমরা সকলের বেশী সম্মান দাও, সে কি এই? আমি বলব, সে এই এবং এ ছাড়া অন্য কিছু নয়। আজ যদি ভগবান এসে বলেন, তুমি স্বর্গ চাও, না শ্রীমতী বিদ্যুৎলতাকে চাও? আমি নিঃসঙ্কোচে বলব, তোমার স্বর্গ তোমার থাক প্রভু, আমায় এই বিদ্যুৎলতাটি দাও। একেই নিয়ে আমি আমার স্বর্গ রচনা করব। আমায় ভীরু বল, কাপুরুষ বল, কিন্তু সবাই যে দুর্ব্বল

প্রগতি তোমায় দিয়েছে আমি তার চেয়ে ঢের বেশী দিয়েছি—আমি দিয়েছি প্রেম।

সমীরণ আস্তে-আস্তে মক্ষির একখানি হাত নিজের হাতের মধ্যে লইয়া বলিল,—তুমি কি রাগ কোরলে ?

মক্ষি হাতখানি ধীরে-ধীরে টানিয়া লইয়া বলিল,—না।

রাগ সে করে নাই। সন্ধ্যাকাশের পানে চাহিয়া সে শুধু ভাবিতেছিল, এই নূতন কথা তাহার জীবনে কতখানি সত্য। সে শক্তিমতী, সে প্রতিভাশালিনী, কিন্তু সে তার চেয়েও বেশী—সে নারী। এ কথা এমন করিয়া সে কখনও ভাবে নাই। এ কথা বুঝিতে তাহার দেরী লাগিবারই কথা।

ছটা বাজিবার পূর্ব্বেই মক্ষি ভিড়েদের বাড়ী যাইবার জন্য আয়োজন আরম্ভ করিল।

ভিড়েদের বাড়ী গিয়া তাহাদের জীবনযাত্রা দেখিবার জন্য তাহার মন সকাল হইতেই উস্‌খুস্‌ করিতেছিল। পূর্ব্বে যে বধূটিকে সে দেখিয়াছে তাহাকে বিশেষত্বহীন বলিলে মিথ্যা বলা হয় না,—এমনই সে সৌষ্ঠববিহীন, অশিক্ষিতা,

পাড়াগাঁয়ের মেয়ে। এমন কি বিধাতা যে-রূপ তাহার দেহে ছড়াইয়া দিয়াছেন তাহাকে মাজিয়া-ঘষিয়া বজায় রাখিবার মতো মার্জ্জিত রুচিও তাহার নাই।

কিন্তু মক্ষি কখনো কোনো গৃহস্থের সংসার দেখে নাই। শুনিয়াছে, মেয়েদের ছোট বয়সে বিবাহ হয়, তারপর স্বামীর ঘর করিতে চলিয়া যায় এবং যাহাদের তাহারা ইতিপূর্ব্বে কখনও দেখে নাই সারা জীবন অসীম মমতায় তাহাদেরই ঘিরিয়া-ঘিরিয়া লূতাতন্তু বুনিয়া চলে। এই প্রথার পক্ষে এবং বিপক্ষে বহুবার বহু তর্কই সে করিয়াছে। এবারে আর তর্ক নয়। সে নিজের চোখে এই অতি দুর্ভাগা নারীদের জীবনযাত্রা দেখিয়া আসিতে চাহে,—নিজের চোখে।

এই কৌতূহল সকাল হইতেই ক্রমাগত তাহাকে অঙ্কুশ মারিতে লাগিল এবং দুটা বাজিবার পূর্ব্বেই বাক্স খুলিয়া বাহিরে যাইবার পোষাক বাছিতে বসিল।

এটা-ওটা-সেটা করিয়া একবার একখানা বাসন্তী রঙের শাড়ী ও ফিকা নীল ব্লাউজ বাহির করিল। আবার কি ভাবিয়া সেগুলা বাক্সে পুরিয়া একখানা নীল শাড়ী ও নীল ব্লাউজ পছন্দ করিল। কিন্তু পরক্ষণেই সেগুলাও ছুঁড়িয়া বাক্সের উপর ফেলিয়া দিয়া অলসভাবে খাটের উপর শুইয়া পড়িল।

বন্ধনী

মানুষ নীড় বাঁধে নীড় বাঁধিবার আনন্দে; মধুচক্র রচনা করে মধু সঞ্চয়ের আনন্দে। এই আনন্দে মাটির পৃথিবীর জন্ম হইয়াছে। এই আনন্দেই কাহারও প্রিয়া উদয়াস্ত পিপীলিকার মতো অক্লান্ত পরিশ্রম করে;—কাহারও প্রিয়া চাঁদিনী রাত্রে সুরের ইন্দ্রধনু রচনা করে। কিন্তু তাহাতে তাহার দেখিবার কি আছে? তাহার এ কৌতূহল কেন? যাহারা তরু-মূলে-মূলে নিয়ত স্নেহরস ঢালিয়া ফুল ফোটায়, ধরণীকে শ্যামলা করে সে তো তাহাদের কেহ নয়। সে মৃত পৃথিবীর বুকে জীবনের স্পন্দন আনিবে। ফুল-ফোটানোর সাধনা তো তাহার নয়, সে যে শব-সাধনায় মগ্ন।

কি হইবে তাহার জানিয়া কেমন করিয়া এতটুকু বালিকা দেখিতে-দেখিতে পুরুষের উদ্দাম, দুরন্ত যৌবনকে পাকে-পাকে বাঁধিয়া ফেলে? পরের মেয়ে অপরিচিত সংসারে আসিয়া খাটিয়া-খাটিয়া কেন দেহপাত করে তাহা জানিয়া তাহার কি লাভ? চাঁদের কৌমুদী তো তাহার নয়, শ্মশানের আগুন অন্ধকারেই মানায় ভালো।

না, না, না, চাঁদের কৌমুদী তাহার নয়। ওই তো একটা লোক দুটি চোখের অঞ্জলি পাতিয়া কেবলই তাহার চারিদিকে ভিক্ষুকের মতো ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তাহাকেই বা কি দিতে পারিল সে? কি দিতে পারে সে? বুকে

যাহার বৈশাখের খর রৌদ্র জ্বলিতেছে তাহার কাছে ছায়া পাওয়ার, স্নিগ্ধতা পাওয়ার আশা কেনই বা করে ও? ও কি আজও তাহাকে চিনিতে পারে নাই?

ভুল, ভুল। বিমল তাহাকে ভুল বুঝিয়াছিল, সমীরণও তাহাকে ভুল বুঝিয়াছে। নীড় বাঁধিবার বস্তু তাহার নাই। তথাপি এত লোক ছাড়িয়া তাহাকেই লইয়া কেন সমীরণ ঘুরিয়া মরে?

সে স্থির করিল, সমীরণকে আর প্রশ্রয় দেওয়া চলিবে না। তাহাকে সকল কথা স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে। কিন্তু মায়া লাগে যে! ওর মুখের পানে চাহিলে শক্ত করিয়া কিছুই যে বলিতে পারা যায় না।

মক্ষি হতাশভাবে আর একবার পাশ ফিরিয়া শুইল। এমন সময় পাঁচীলের ওপার হইতে কে যেন অতি মৃদুকণ্ঠে ডাকিল,—বহিন্।

জানালা দিয়া উঁকি মারিয়া মক্ষি দেখিল, সত্যবতী সহাস্যমুখে পাঁচীলের ওপারে দাঁড়াইয়া আছে। এবং দেখা না গেলেও বেশ বোঝা গেল তার, বোধ হয়, বড় ছেলেটিই নীচে হইতে কাপড় ধরিয়া টানিয়া তাহাকে বিব্রত করিতেছে।

মক্ষি তাড়াতাড়ি বলিল,—যাচ্ছি। এবং কোনো বেশভূষা না করিয়াই খিড়কী দিয়া বাহির হইয়া পড়িল।

বন্ধনী

ভিড়েদের বাড়ীটি অবিকল তাহাদেরই মতো ;—দুখানি শয়ন কক্ষ, একটি রান্নাঘর আর সামনে এক ফালি উঠান। ভিড়ের বৃদ্ধা জননী তখন উঠানে একটা পা ছড়াইয়া জাঁতায় গম পিষিতেছিলেন এবং তাঁহারই সুমুখে ভিড়ের বড় ছেলেটি একটা তিন-পা-ওয়ালা মাটির ঘোড়াকে দাঁড় করাইবার অসাধ্যসাধনে নিমগ্ন ছিল। একে উঠানটি ঠিক সমতল নয়, তার উপর তিনখানি মাত্র পা সম্বল করিয়া বেচারা ঘোড়ার দাঁড়াইবার কোনো উপায় ছিল না।

এমন সময় মক্ষি আসিল। ঘোড়া বেচারা বাঁচিয়া গেল। বড় ছেলেটি মাটির ঘোড়া মাটিতে ফেলিয়া রাখিয়া ছুটিয়া গিয়া মক্ষির হাত ধরিয়া সাদরে এমন একটি টান দিল যে, মক্ষি ছাড়া অপর কোনো মেয়ে হইলে সেইখানেই তাহাকে ভূ-শয্যা গ্রহণ করিতে হইত। ছোটটি বারান্দায় মায়ের পিছু-পিছু অকারণ ঘুরিতেছিল। জ্যেষ্ঠের দেখাদেখি সেও সুমুখের দিকে দুটি কচি বাহু বাড়াইয়া দিয়া টলিতে-টলিতেই মক্ষির দিকে ছুটিতে লাগিল।

ভিড়ের বৃদ্ধা জননীও ফোঁকলা দাঁত বাহির করিয়া সম্বর্দ্ধনা-সূচক কি যেন বলিলেন, কিন্তু ছেলেদের কাকলীর ভিতর তাহার এক বর্ণও বোঝা গেল না। শুধু বোঝা গেল, মক্ষির আগমনে তিনি অত্যন্ত প্রীত হইয়াছেন।

ব্যস্ত হইয়া উঠিল সত্যবতী। সে একবার বড় ছেলেটিকে ধমক দিল,—এই দিবাকর! একবার ছোটটিকে ধমক দিল, —এই প্রভাকর! কিন্তু তাহাতে অবস্থার কোনো পরিবর্ত্তন হইল না দেখিয়া মক্ষির একখানি হাত ধরিয়া টানিতে-টানিতে ঘরের ভিতর লইয়া গেল।

বাড়ীর অবস্থা দেখিয়া সে বিস্মিত হইয়া গেল। বাড়ীটিকে ইহারা যেন দেবমন্দিরের মতো করিয়া রাখিয়াছে। উঠান হইতে ঘরের ভিতর পর্য্যন্ত কোথাও এতটুকু জঞ্জাল জমিয়া নাই, যেন সিন্দুর পড়িলে তুলিয়া লওয়া যায়।

উঠানের এক কোণে একখানা খাটিয়া দেওয়ালে ঠেসান দিয়া রাখা হইয়াছে। বারান্দার একধারে একখানি বেতের দোল্না ঝুলিতেছে। ঘরের মধ্যে খাট-পালঙ্কের কোনো বালাই নাই,—একধারে বাক্সগুলি এবং একধারে গুটানো বিছানাগুলি সুবিন্যস্তভাবে সাজানো।

মক্ষি বলিল,—এখানি বুঝি তোমার শোবার ঘর?

উত্তরে সত্যবতী যে রকম সলজ্জভাবে সায় দিল, তাহাতে মক্ষিও বুঝিল, একবচনের প্রয়োগ সুষ্ঠু হয় নাই। সেও ঈষৎ না হাসিয়া থাকিতে পারিল না।

একখানি ছোট ঘরের একধারে একই দুগ্ধফেননিভ শয্যায় দুটি নরনারী পরস্পরের একান্ত সন্নিকটে রাত্রিযাপন

করে,—এত সন্নিকটে যে ঘুমের ঘোরেও একে অন্যের স্পর্শ পায়।

সত্যবতী তখনও লজ্জানত চোখ তুলিতে পারে নাই। ইহারই মধ্যে মক্ষির মনে কি ঝড় বহিয়া গেল, সে একেবারে তার গলা জড়াইয়া ধরিয়া প্রশ্ন করিল,—তুমি কি বেশ সুখে আছ? কোনো কষ্ট তোমার নেই?

মক্ষির মনে কি প্রশ্ন জাগিয়াছিল তাহা সত্যবতী ঝিল না। তবু শুধু অকারণ আনন্দে এবং লজ্জায় তার মাথা মক্ষির বুকের কাছে আরও ঝুঁকিয়া পড়িল।

তার পিঠে হাত বুলাইতে-বুলাইতে মক্ষি বলিল,—কোথায় আনন্দ সেইটে আমি বুঝি না। যে সংসারে তুমি খেটে মরছ, তাতে তোমার কোনো অধিকার নেই। একটি পুরুষ তোমায় খেতে দিচ্ছে, পরতে দিচ্ছে, আর অবসর সময়ে খুসী হোলে একটু সোহাগ জানিয়ে যাচ্ছে। এতেই তুমি আহ্লাদে গ'লে পড়ছ, আর দ্বিগুণ উৎসাহে খেটে সারা হচ্ছ। আবার পান থেকে চুণ খস্‌লে তারও শাস্তি আছে।

একটু থামিয়া মক্ষি বলিল,—ঠিক পোষা কুকুরের মতো। বেত খেলেই আর্ত্তনাদ করতে-করতে ছোটে, আবার তখুনি আদর করে ডাকলেই কাছে এসে আহ্লাদে লেজ নাড়ে।

মক্ষির কথা শুনিয়া সত্যবতী গভীর বিস্ময়ে সোজা হইয়া উঠিয়া বসিয়াছে। কিন্তু মক্ষির সেদিকে খেয়ালই নাই। সে অন্যদিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিল,—আচ্ছা, তোমার স্বামীর সঙ্গে তোমার কোনোদিন ঝগড়া হয় নি? কোনো দিন তোমার স্বামী তোমার সঙ্গে অন্যায় ব্যবহার করেন নি? তার পরেও তোমার স্বামীর পরে শ্রদ্ধা রইল? মানুষের শ্রদ্ধা কি চার যুগে অমর?

সত্যবতী সবিস্ময়ে কহিল,—এ সব কি কথা আপনি জিগ্যেস করছেন? এক সঙ্গে ঘর কোরতে গেলে ঝগড়া আবার কার না হয়? আপনার স্বামীই কি কখনও আপনার সঙ্গে অন্যায় ব্যবহার করেন নি? তার জন্যে কি কখনও আপনার স্বামীর পরে শ্রদ্ধা কমেছে?

"আপনার স্বামী" কথাটায় মক্ষির যেন চমক ভাঙ্গিল। প্রসঙ্গটিকে সহজ করিবার জন্য সে একটু হাসিয়া বলিল,—কমে না?

এতক্ষণে সত্যবতী যেন অকূলে কূল পাইল! এবং এত বড় একটা পরিহাস ধরিতে পারে নাই ভাবিয়া অপ্রস্তুতভাবে হাসিয়া মক্ষিকে একটা ঠেলা দিয়া বলিল,—আপনি যেন কি, দিদি! সত্যি আমার এমন ভয় ধরেছিলো! আমি ভেবেছিলাম—

সত্যবতী কথাটা আর শেষ করিল না, টিপিয়া-টিপিয়া কটাক্ষে হাসিতে লাগিল।

একটু পরে সত্যবতী বলিল,—কিন্তু সত্যি দিদি, অকারণে এসে যখন বকে তখন বড় রাগ হয়, মনে হয় আর কোনো সম্পর্ক রাখবো না। একদিনকার কথা আপনাকে বলি, শুনুন,—

বলিয়া নড়িয়া-চড়িয়া বিজয়িনীর মতো বসিয়া বলিতে লাগিল,—

রান্না হোতে একদিন একটু দেরী হয়েছে, এই আর যাবে কোথায় ? রেগে-মেগে চীৎকার কোরে এমনি কথা বলতে লাগলো যে, আমাদের তুই শাশুড়ী-বৌকে নাকের-জলে চোখের-জলে কোরে ছাড়লে। ভাবলাম, মারেই বুঝি। এমন মনটা খারাপ হোয়ে গেল তা আর আপনাকে কি বলবো। আমি কি মাইনে-করা রাঁধুনী, না ঝি! সে কথা আপনি শোনেন নি, একেবারে বংশ পর্য্যন্ত তুলে। ভাবলাম, ওর মুখ আর দেখবো না। বিকেল বেলায় দেখি, এক বাক্স সাবান, এক শিশি তেল কিনে এনে কেবলি এঘর-ওঘর ঘোরা-ঘুরি করছে। আমি তো একেবারে শাশুড়ীর পেছনে রান্নাঘরে বসে। শাশুড়ী খাবারটা দিয়ে আসবার জন্যে বার তুই বললেন, আমি কিন্তু কোনো সাড়াই দিলাম না। শেষে

তিনি নিজেই গিয়ে দিয়ে এলেন। সন্ধ্যেবেলাটাও এমনি কোরেই কাট্‌লো। অনেক রাত্রে যখন শুতে গেলাম, তখন মাথাটা ভয়ানক ধরেছে। আস্তে আস্তে আর একদিকে মাদুর পেতে শুয়ে পড়লাম।

তারপরে কি জ্বর! উঃ! দু'দিন কোনো জ্ঞানই ছিল না। যখন জ্ঞান হোল দেখি, নিজের বিছানায় শুয়ে আছি। ওর চোখ বসে গেছে, মাথার চুল উস্কো-খুস্কো। আমার শিয়রে বসে কেবলি কাঁদছে। আপনিই বলুন দিদি, তখন আর রাগ থাকে? পাশ ফিরে শুতে পারি না, তবু দু'হাত বাড়িয়ে—

বলিয়া সত্যবতী মক্ষিরই দু'খানি হাত জড়াইয়া ধরিল।

অত্যন্ত মামুলি গল্প। শতকরা একশত জন স্বামী-স্ত্রীর এমনি ঝগড়া হয়। দিনে বহু আড়ম্বরে কলহ বাধে এবং রাত্রে অতি সহজেই তার নিষ্পত্তি হইতেও দেরী হয় না। এ সম্বন্ধে অনেক তর্কই তোলা যায়। কিন্তু মক্ষি 'ফ্রয়েড' পড়ে নাই।

তার মনে অন্য প্রশ্ন জাগিতেছিল। সে বলিল,—কিন্তু তোমার পতিদেবতা কালকে যদি অন্য ফুলের মধুর নেশায় মত্ত হোয়ে ওঠেন, তাহোলে? তাহোলেও কি এই শ্রদ্ধা রাখা সম্ভব হবে?

সত্যবতীর মুখ পাংশু হইয়া উঠিল। সে শুষ্ককণ্ঠে বলিল,—সে আশঙ্কা আজও মনে আসে নি দিদি। আমার অদৃষ্টে তাই যদি থাকে, তাহোলে কি যে কোরব তাও জানিনে।

একটু ভাবিয়া লইয়া বলিল,—কিন্তু তাহোলেও কি-ই বা কোরতে পারি? ছেলে দুটো রয়েছে যে! ওদের মর্য্যাদা বাঁচাতে গেলে এইখানেই আমায় পড়ে থাকতে হবে। অন্যের আশ্রয়ে ওদের মুখ নামিয়ে থাকতে হবে সে আমি সইতে পারবো না।

রাগে মক্ষির সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল। বলিল,—শুধু এই? আর কোনো প্রতিশোধ তুমি নিতে পারো না?—অত্যন্ত নিষ্ঠুর, অত্যন্ত রূঢ় কোনো প্রতিশোধ?

কথাটা কিন্তু সত্যবতী বুঝিতেই পারিল না। অবাক হইয়া সে মক্ষির জ্বলন্ত চোখ দুটার পানে চাহিয়া কহিল,—এমন কি প্রতিশোধ নিতে পারি?

পরক্ষণেই চোখ নামাইয়া নিম্নস্বরে কহিল,—কিন্তু তোমার কাছে বলে ফেলছি দিদি, আমার বড়-দার স্বভাব বড় ভালো নয়। এই নিয়ে বৌদি যে কি ভাবে দিন কাটায় সে আমি চোখের সামনে দেখেছি। বড়-দাকে যে বাঁধতে পারলো না এই লজ্জায় বৌদি কাউকে মুখ দেখাতে পারে না। কাঁদতে-কাঁদতে সে নিজে আমাকে এ কথা বলেছে। বড়-দাকে নিয়ে লজ্জা কি আমাদেরই কম, দিদি? তার 'পরে শ্রদ্ধাও কি

তেমন আছে? তবু স্নেহ তো কমে নি। তার অমঙ্গলের কথা ভাবতে গেলেও বুকের ভেতর হু হু কোরে ওঠে।

জানালার ফাঁক দিয়া এক টুক্‌রা রোদ ও-পাশের দেওয়ালে আসিয়া পড়িয়াছিল। তাহারই আভায় সত্যবতীর অশ্রুসজল মুখখানি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। মক্ষি নির্নিমেষে সেদিকে চাহিয়া রহিল।

সেদিকে কোনো লক্ষ্য না করিয়াই সত্যবতী কহিতে লাগিল,—সব এক, সব এক, দিদি। ভালো যে বেসেছে, তার বাঁচবার কোনো উপায় নেই। তাই সহস্র সতীন নিয়েও নারী গভীর প্রেমেই নিজেকে স্বামীর বাহুবন্ধনে সঁপে দেয়, আর সহস্র পুরুষের উপভোগ্য যে নারী তারও পদমূলে নিজেকে বিকিয়ে দিতে পুরুষের বাধে না। দিদি, গুণের হিসাব কোরে যদি ভালোবাসতে হয়, তাহোলে দুনিয়াতে ক'জন পুরুষ আছে যাদের সর্ব্বান্তঃকরণে ভালোবাসতে পারা যায়?

কিন্তু পরক্ষণেই সকাতরে বলিল,—দোহাই দিদি, এসব কথা থাক্। এসব আলোচনা মনে-মনেও কোরতে নেই।

মক্ষি অবাক হইয়া দেখিল, সত্যবতীর মুখে ব্যথার গভীর রেখা ফুটিয়া উঠিয়াছে,—এত গভীর যে, ছেলে দুটির পর্য্যন্ত চোখে পড়িয়াছে। প্রভাকর মায়ের কোলের উপর হাঁটু

গাড়িয়া দুটি ছোট-ছোট হাত দিয়া তার মুখখানিকে নিজের দিকে ফিরাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে এবং দিবাকর খেলা ভুলিয়া দেওয়ালে পিঠ দিয়া স্তব্ধ, ব্যথিত নেত্রে মায়ের পানে ঠায় চাহিয়া আছে।

এমন দৃশ্য মক্ষি কখনো দেখে নাই। তার শরীরের গ্রন্থি যেন ক্রমশ শিথিল হইয়া আসিতেছিল, আর মনে হইতেছিল, পক্ষাঘাত যেন অজগর সর্পের মতো তার কুশাগ্রশাণিত বুদ্ধিকে ধীরে ধীরে গ্রাস করিতেছে। সে অলসভাবে পিছনের দেওয়ালে ঠেস দিয়া বাহিরের পানে চাহিয়া রহিল।

অনেকক্ষণ পরে সোহাগ-মাখানো অভিমানের ভঙ্গিতে সত্যবতী বলিল,—আপনি মানুষকে মিছিমিছি ভারী কাঁদাতে পারেন! আপনি ভারী দুষ্টু!

মক্ষির চিন্তাধারা তখন বহু দূরের পথ খুঁজিতে-ছিল। কিন্তু গতি তার লুপ্ত হইয়া গেছে। সে চিন্তা ভগ্নকটি সাপের মতো শুধু একই স্থানে আঁকিয়া-বাঁকিয়া, মাথা কুটিয়া নিজেকেই পীড়িত ও ক্লান্ত করিতেছিল।

সত্যবতীর অভিমানের সুরটুকুই শুধু তার কানে গেল। তার বুকের পুঞ্জীভূত ব্যথা একবার ঠোঁটের কোণে কাঁপিয়া উঠিল। কিন্তু সেদিকে পথ না পাইয়া অতি মৃদু দীর্ঘ-

শ্বাসের সঙ্গে বাহির হইয়া গেল। মক্ষি কোনো কথাই কহিতে পারিল না। সে শুধু তার ডান হাতখানি বাড়াইয়া দিয়া সত্যবতীর পিঠের উপর রাখিল।

বহুক্ষণ ধরিয়াই দিবাকর মায়ের চোখে জল দেখিয়া আপনার মনেই রাগে ফুলিতেছিল। এই অতি ক্ষুদ্র বিসুবিয়াসটি অকস্মাৎ অগ্ন্যুদ্গার করিয়া উঠিল। ঝগড়ার স্বাভাবিক যে প্রক্রিয়া তার কোনোটিই তাহার চোখে পড়ে নাই। কিন্তু ঘরে তৃতীয় ব্যক্তি না থাকায় সে অতি সহজেই অনুমান করিল, মক্ষিই তাহার মাকে কাঁদাইয়াছে। অত বড় মেয়ের সামনে তথাপি সে ধৈর্য্য ধরিয়াই ছিল। কিন্তু সে সংযমের বাঁধ সে কোনোক্রমেই আর রাখিতে পারিল না, এবং এই পুরুষ-শিশু লাফাইয়া মক্ষির সুমুখে আসিয়া হাতের খেলনা উঁচাইয়া দাঁড়াইল।

এক মুহূর্ত্তে ঘরের গুমট কাটিয়া গেল। দুটি মেয়েই এই কাণ্ড দেখিয়া অত্যন্ত জোরে হাসিয়া উঠিল এবং ক্রোধে কম্পমান বিসুবিয়াস হাতের খেলনা দূরে ফেলিয়া দিয়া মায়ের কোলে আছড়াইয়া পড়িয়া এমনি জোরে পা ছুঁড়িতে লাগিল যে, মায়ের পক্ষে সে তাল সামলানো কঠিন হইয়া উঠিল। রাগে ছেলেটার মুখ-চোখ লাল হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু কাঁদে না, শুধু মেঝের উপর পা ছোঁড়ে।

বন্ধনী

অনেকক্ষণ পরে রাগ থামিল, এবং রাগ যে থামিয়াছে তার চিহ্নস্বরূপ দিবাকর দিগ্বিজয়ী রাজার মতো মক্ষির কোলের উপর বিজয়-গর্ব্বে গিয়া বসিল। এক-পশলা বৃষ্টি হইয়া গেছে, তথাপি তার মুখের উপর হইতে গুমটের চিহ্ন সম্পূর্ণভাবে মুছিয়া যায় নাই। মক্ষি অতৃপ্তভাবে সেই মুখখানি বারম্বার চুম্বন করিতে লাগিল।

প্রভাকর দূরে সরিয়া অবাক হইয়া দাদার রণকৌশল দেখিতেছিল। দিবাকর যখন মায়ের কোলে আছাড়ি-পিছাড়ি করিতেছিল সে বিজ্ঞের মতো সরিয়া গিয়াছিল। বুঝিয়াছিল, সরিয়া না গেলে এ তোড়ের মুখে সে কুটার মতো ভাসিয়া যাইবে। এখন জোয়ার কাটিয়া যাইতে সে অগ্রজের সৌভাগ্যে ঈর্ষান্বিত হইয়া উঠিল এবং আপনার ন্যায্য অংশ গ্রহণ করিবার জন্য মক্ষির মুখের কাছে মুখ বাড়াইয়া দিল।

কচি শিশুর ঠোঁটে এত মধু! মক্ষির যেন আর তৃপ্তির শেষ হইতেছিল না। কিন্তু প্রভাকর অতি সুবিবেচক ব্যক্তি। নিজের ন্যায্য অংশ বুঝিয়া পাইতেই সে মক্ষির মুখখানি মায়ের দিকে ফিরাইয়া মায়ের ঠোঁট দুখানির দিকে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিল।

মক্ষির আজ কি হইয়াছে, কে জানে। সে খিল্ খিল্

করিয়া হাসিয়া উঠিয়া সত্যবতীকে জড়াইয়া ধরিল, এবং তাহার যথেষ্ট অনিচ্ছা সত্ত্বেও তার মুখখানি টানিয়া তুলিয়া সেখানে গোটা কয়েক চুমু আঁকিয়া দিল।

মুখ সরাইয়া লইয়া সত্যবতী বলিল,—দিদি যেন কী!

ফিরিবার পথে মক্ষির মনে হইল তাহার দেহের ওজন একেবারে হাল্কা হইয়া গেছে। পা যেন মাটি ছুঁইয়াও ছোঁয় না।

বেলা তখন চারটার বেশী হইবে। মক্ষি তাড়াতাড়ি চা তৈরী করিতে বসিল। কিন্তু চায়ের জল ফুটিয়া-ফুটিয়া নিঃশেষ হইয়া গেল, তথাপি সমীরণের আসিবার নামটি নাই। মক্ষি রীতিমত অধৈর্য্য হইয়া উঠিল।

একবার গিয়া দোকান ঘরের ভিতরের দিকের দরজায় কান পাতিল। সমীরণ তখন একজন গ্রাহকের সঙ্গে কয় আনা পয়সা লইয়া একরকম ধ্বস্তাধ্বস্তি বাধাইয়া দিয়াছে। ব্যাপার দেখিয়া মক্ষির হাসি আসিল। দোকানদারী যে সমীরণকে এমন করিয়া পাইয়া বসিতে পারে তাহা সে

ভাবিতেই পারে নাই। মুহূর্তের মধ্যে তার মনে পড়িয়া গেল অতীত দিনের সেই ঘটনাটি, যেদিন সমীরণ ছাদে চাঁদের আলোয় বসিয়া গত জন্মের প্রিয়াকে তন্ময় হইয়া স্বপ্ন দেখিতেছিল। কথাটা ভাবিতেই মক্ষির সর্ব্বাঙ্গে যেন পুলকের বিদ্যুৎ বহিয়া গেল। চোখের সামনে সমীরণের সেই তন্দ্রা-বিজড়িত আবেশমাখা চোখ দুটি ভাসিয়া উঠিল। সেদিনে তার পানে চাহিয়া সমীরণের যেন আর চোখের পলক পড়িতে চাহিতেছিল না। তার মধ্যে কি দেখিয়াছিল সে ?

মক্ষির দেহলতা প্রদীপের শিখার মতো কাঁপিয়া উঠিল। মনে হইল, সে বুঝি আর দাঁড়াইতে পারে না। কেহ আসিয়া যদি তাহাকে সর্ব্বাঙ্গ দিয়া বেষ্টন করিয়া ধরে সে বাঁচিয়া যায়।

কতক্ষণ পরে তাহার যেন মনে হইল, দোকানের গণ্ডগোল থামিয়া গেল। গ্রাহকটি আপন মনেই বিড় বিড় করিতে-করিতে চলিয়া যাইতেছে এবং টাকা বাজাইতে-বাজাইতে সমীরণ মধুর কণ্ঠে তাহাকে বুঝাইয়া দিতেছে যে, যত সস্তায় সে কাপড় লইয়া গেল এত সস্তায় কেহ কোনোদিন পায় নাই। গ্রাহক মহাশয়ের বিশেষ খাতিরেই সে অত সস্তায় মাল ছাড়িয়া দিল।

আপনাকে সামলাইয়া লইয়া মক্ষি আবার রান্নাঘরে ফিরিয়া আসিল। চায়ের কেৎলী হইতে তখন প্রচুর পরিমাণে ধোঁয়া উঠিতেছিল। উর্দ্ধায়মান ধোঁয়ার কুণ্ডলীর পানে চাহিয়া সেও ভাবিতে লাগিল,—সে ভাবনার কোনো কূল-কিনারা নাই,—ধোঁয়ার মতো অস্পষ্ট, অথচ সূক্ষ্ম এলোমেলো ভাবনা, যা তার অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতকে একাকার করিয়া দিল। আর তারই মাঝে রহিয়া-রহিয়া অতি অস্পষ্ট আশার আলো এমন করিয়া ঝিলিক মারিতে লাগিল যে, নিজেকে সামলাইয়া রাখা কঠিন হইয়া পড়িল।

এমন সময় সমীরণ আসিয়া পরিহাসের ভঙ্গিতে বলিল, —নমস্কার! গ্রাহককে ঠকাইয়া সমীরণ বোধ হয় অত্যধিক খুসী হইয়া উঠিয়াছিল।

প্রত্যুত্তরে মক্ষিও একটা নমস্কার করিয়া ফেলিয়া অপ্রস্তুত ভাবে হাসিতে লাগিল। মক্ষিকে এমন করিয়া হাসিতে সমীরণ কখনও দেখে নাই। তার সমস্ত দেহ হাসির আনন্দে নদীর তরঙ্গের মতো হিল্লোলিত হইয়া উঠিতেছিল। সমীরণ অবাক হইয়া সেদিকে চাহিয়া রহিল। কথার আনন্দে মানুষ হাসে, কিন্তু সে অন্য। ও যেন হাসির আনন্দেই অফুরন্ত হাসিয়া চলিয়াছে।

বন্ধনী

উঠানে খাটিয়ার নীচে একবাটি চা রাখিয়া মক্ষি বলিল,—এইখানে বোসে চা-টুকু খাও দিকি। আজকে তোমার দেরী করার মজা দেখাচ্ছি। খাবার তৈরী হবে, সেই খাবার খেয়ে তবে বেরুতে পাবে। ততক্ষণ ওইখানে চুপ কোরে বোসে থাক।

এ কথার সমীরণ কোনো জবাব দিল না। বিস্ময় তার তখনও কাটে নাই। তার কেবলি মনে হইতেছিল, এ বুঝি অন্য মেয়ে মক্ষির মুখ দিয়া কথা কহিতেছে। দুটি ভীরু, বুভুক্ষু চক্ষু দিয়া সে মক্ষির গতিভঙ্গি দেখিতে লাগিল।

ছোট রান্না ঘরখানির মধ্যে মক্ষির গতি অপরূপ লীলা-ভঙ্গে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। ফুল-বাগিচায় ছোট গণ্ডীর মধ্যে ভ্রমরের পাখায় যেমন অফুরন্ত গতির স্পন্দন জাগে তেমনি,—চলিতে পারে না, শুধু তীব্র গতিবেগে কাঁপিয়া সারা হয়।

মক্ষি চিরদিন এমনি,—দুর্দ্দম তার গতি। বাধা মানিতে চাহে না। সমস্ত শক্তি নিয়া সে প্রবল বেগে বাঁধের উপর আছড়াইয়া পড়ে। এত প্রচুর, এত প্রবল এবং এত তীব্র শক্তি তাহার নারী-দেহ ও নারী-মন বহিতে পারে না, সহিতে পারে না। ভূমিকম্পে বসুন্ধরা

যেমন করিয়া কাঁপে, তার দেহ-মন তেমনি করিয়া কাঁপিয়া ওঠে, ভয় হয় সব শুদ্ধ এখনি ভাঙ্গিয়া পড়িল বুঝি।

খাবার তৈরী করিতে মঙ্কির আধ ঘণ্টার বেশী লাগিল না। একখানি রেকাবীতে অতি পরিপাটি করিয়া খাবার সাজাইয়া সমীরণের কাছে দিতে যাইবার সময় তার যেন আর পা চলিতে চাহিল না। একবার মনে হইল, যেন বাড়াবাড়ি হইতেছে। সমীরণ হয়তো কি ভাবিয়া বসিবে। কিন্তু বাহিরের পানে আড়চোখে চাহিতেই দেখিল, সমীরণ তারই পানে চাহিয়া আছে। ত্রুটি সংশোধনের অবসর আর মিলিল না। সমস্ত দ্বিধা সবলে সরাইয়া সে খাবার আনিয়া সমীরণের সুমুখে রাখিল। কিন্তু সমীরণের পানে চোখ তুলিয়া আর চাহিতে পারিল না।

—একটু দাঁড়াও, জল আনছি।

ত্বরিত পদে এক গ্লাস জল আনিয়া সে একরকম জোর করিয়াই সমীরণের পায়ের কাছে মাটির উপরই বসিয়া পড়িল এবং গভীর উত্তেজনায় ঘামিতে লাগিল।

খাবারের পরিমাণ দেখিয়া সমীরণের হাসি আসিল। সে গম্ভীরভাবে বলিল,—আজ রাত্রে কি রান্না হবে না?

—হবে না কেন?

—বিকেলের জলখাবারের যা আয়োজন দেখাচ্ছ, তার পরে রাত্রে রান্না করার কি দরকার হবে ?

এই লঘু পরিহাসে মক্ষির অবস্থা যেন সহজ হইয়া আসিল।

সে সকৌতুকে ঘাড় নাড়িয়া বলিল,—হয়েছে, আর বাহাদুরী কোরতে হবে না।—ঠোঁট উলটাইয়া মক্ষি বলিল,—ভারি তো খাবার !

সমীরণ খাবার খাইতে-খাইতে বলিল,—তা ঠিক। বঙ্কিমের জীবানন্দ একাই একটা কাঁঠাল খেয়েছিল,—তার ওপর পান্তা ভাতের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম।

—তবে ?

সমীরণ গম্ভীর ভাবে বলিল,—কিন্তু তার জন্যে যে জীবানন্দের পেটের অসুখ হয় নি, এমন কথা 'আনন্দমঠে' কোথাও লেখা নেই।

মক্ষি হাসিয়া বলিল,—তা নেই। কিন্তু পেটের অসুখ যে হয়েছিল তারও কোনো প্রমাণ নেই।

কথাটা সমীরণ মানিয়া লইল। বলিল,—তা নেই।

—তবে ?

—হুঁ। সুতরাং আমাকেও সমস্ত গুলোই খেতে হবে। নইলে হেরে যাব। কি বল ?

মক্ষি হাসিয়া ঘাড় নাড়িয়া সায় দিল।

সমীরণ বলিল,—তাহোলে বুঝলে মক্ষি, ছিয়াত্তুরের মন্বন্তর কেন হয়েছিল ?

এই গবেষণায় মক্ষি হাসিয়া উঠিল। বলিল,—গবেষণা মৌলিক বটে, কিন্তু ঠিক হৃদয়ঙ্গম কোরতে পারলাম না।

সমীরণ বিস্মিত ভাবে বলিল,—বলো কি! একটা লোক, যার পেছুনে সরকারী ফৌজ তাড়া করেছে এবং দেখতে পেলেই সঙ্গে সঙ্গে হাতকড়ি দেবে,—সে একটা কাঁঠাল নির্ব্বিবাদে খেয়ে ফেললে! এর পরেও তোমার হৃদয়ঙ্গম কোরতে দেরী হচ্ছে, কেন ছিয়াত্তুরের মন্বন্তর হয়েছিল ?

—কিন্তু এখন, যখন একখানা নিম্‌কী আর একটা রসগোল্লা খেলেই মানুষের অম্বল হয়, এখনই বা মন্বন্তরের অবসান হোল কই ?

—তা হোল না বটে।

একটু পরে সমীরণ হঠাৎ বলিল,—কিন্তু নিমিটা সত্যিই পোড়ামুখী।

—নিমির অপরাধ ?

সমীরণ হাতের খাবার নামাইয়া রাখিয়া উত্তেজনার ভঙ্গিতে খাটিয়ায় একটা চাপড় মারিতেই মক্ষি শশব্যস্তে তাহাকে বাধা দিয়া বলিল,—কিন্তু নিমির যদি অপরাধ হ'য়েই

থাকে, তার জন্যে দুর্ব্বল খাটিয়াটাকে কেন দুঃখ দেওয়া ? ও কি তোমার চাপড় সইতে পারবে ?

—কিন্তু নিমির অপরাধটা শোনো,—সে খেতে দিতেই জানে না।—বুঝতে পারলে না ?

—না মহাশয়।

সমীরণ সোজা হইয়া বসিয়া বলিল,—আরে, শান্তি রইলো আড়ালে, আর নিমি বস্‌লো ভাইকে খাওয়াতে। তার যদি কিছুমাত্র কাণ্ডজ্ঞান থাকতো, তাহোলে শান্তিকেই সামনে বসিয়ে রেখে নিজে একটা কোনো ছুতোয় উঠে যেত। হোলোও তেমনি, ভীমের দ্বাদশীর পারণ। আরে রামঃ! ওকে কি খাওয়া বলে? ও শুধু ক্ষুন্নিবৃত্তি মাত্র।

মক্ষি হাসিয়া বলিল,—তাহোলে দাঁড়াচ্ছে এই যে, খাওয়া এবং ক্ষুন্নিবৃত্তি দুটি পৃথক পদার্থ।

—আজ্ঞে হ্যাঁ মহাশয়। ওর চেয়ে বরং রবীন্দ্রনাথ ভালো। বিমলা সন্দীপকে যখন খেতে দিল, তখন শুধু অন্ন নয়, তার সঙ্গে অন্নপূর্ণাও উপস্থিত ছিলেন। সন্দীপের সেই কথাটি মনে আছে তো ?—'আমাকে পেটুক ঠাওরাবেন না, আমি খাবার লোভে এখানে আসিনি। আমার লোভ কেবল আপনি ডেকেছেন বলে।' এতে কোরে, স্থূল বৃত্তি-গুলো তলায় পড়ে যায় এবং খাওয়াটা হ'য়ে দাঁড়ায়

সময়-হরণের উপলক্ষ মাত্র, লক্ষ্য যে কি সে না বললেও চলে।

কথার স্রোত নিমির দিক হইতে বিমলার দিকে মোড় ফিরিতে মক্ষি কেমন অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল। সহজ ভাবে এই প্রসঙ্গে যোগ দিতে পারিল না, শুধু গভীর আশঙ্কায় রুদ্ধনিশ্বাসে কথার শেষ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে লাগিল।

সমীরণ বলিতে লাগিল,—কিন্তু সব চেয়ে বেশী ফুটিয়েছেন শরৎচন্দ্র। 'পল্লী সমাজে' রমা যখন রমেশকে খাওয়াচ্ছে—

উত্তেজনার আবেগে সমীরণ দুইটা হাত ঘসিতে-ঘসিতে বলিল,—কিন্তু সে জায়গাটা তোমাকে আমি পড়ে শোনাচ্ছি দাঁড়াও।

এক মিনিটের মধ্যে সমীরণ একখানা 'পল্লীসমাজ' আনিয়া পড়িতে লাগিল,—

সম্মুখে বসিয়া আহার করাইয়া, পান দিয়া, বিশ্রামের জন্য নিজের হাতে সতরঞ্চি পাতিয়া দিয়া, রমা কক্ষান্তরে গেল।...রমা বিশেষ কিছুই এখানে তাহার আহারের জন্য সংগ্রহ করিতে পারে নাই। নিতান্তই সাধারণ ভোজ্য ও পেয় দিয়া তাহাকে খাওয়াইতে হইয়াছে। এইজন্য তাহার বড় ভাবনা ছিল, পাছে তাহার খাওয়া না হয় এবং পরের কাছে নিন্দা হয়। হায় রে পর! হায় রে তাদের নিন্দা! খাওয়া না হইবার দুর্ভাবনা তাহার নিজেরই কত আপনার!...এই আহার্য্যের স্বল্পতার

ত্রুটি শুধু যত্ন দিয়া পূর্ণ করিয়া লইবার জন্যই সে সম্মুখে আসিয়া বসিল। আহার নির্ব্বিঘ্নে সমাধা হইয়া গেল, গভীর পরিতৃপ্তির যে নিশ্বাসটুকু রমার নিজের বুকের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিল, তাহা রমেশের নিজের চেয়ে যে কত বেশী, তাহা আর কেহ যদি না জানিল, যিনি সব জানেন, তাঁহার কাছে ত গোপন রহিল না।

সমীরণ আড়চোখে একবার মক্ষির পানে চাহিয়া দেখিল, তার মাথা যেন মাটির সঙ্গে মিশিবার জন্য ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। সে পড়িতে লাগিল,—

প্রত্যুত্তরে রমেশ শুধু একটা নিশ্বাস ফেলিল। খানিক পরে রমার মত ধীরে ধীরে বলিল,—"কিন্তু তোমাকে স্মরণ ক'রে বলছি, আজ আমার এ কথা কোন মতেই মনে হচ্ছে না। আমি তোমার তো কেউ নয় রমা, বরং তোমার পথের কাঁটা। তবু প্রতিবেশী ব'লে আজ তোমার কাছে যে যত্ন পেলুম, সংসারে ঢুকে এ যত্ন যারা আপনার লোকের কাছে পায়, আমার তো মনে হয়, পরের দুঃখ-কষ্ট দেখলে তারা পাগল হ'য়ে ছোটে। এই মাত্র আমি একা ব'সে চুপ ক'রে ভাবছিলুম, আমার সমস্ত জীবনটি যেন তুমি এই একটা বেলার মধ্যে আগাগোড়া ব'দ্‌লে দিয়েচ। এমন ক'রে আমাকে কেউ কখনও খেতে বলেনি, এত যত্ন ক'রে আমাকে কেউ কোনদিন খাওয়ায় নি। খাওয়ার মধ্যে যে এত আনন্দ আছে, আজ তোমার কাছে প্রথম জানলাম, রমা।

সমীরণ আর পড়িতে পারিল না। দুর্দ্দম আবেগে উঠিয়া একেবারে মক্ষির অতি সন্নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। মক্ষির সমস্ত দেহ তখন থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল এবং যেন কিসের প্রতীক্ষায় সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল। কিন্তু সমীরণ প্রাণপণ বলে আপনাকে সামলাইয়া লইয়া বলিল,

—আমার বাইরে নিমন্ত্রণ আছে। রাত্রে আর খাবো না। ফিরতে দশটা হবে।

এক নিশ্বাসে কোনোমতে এই কয়টা কথা বলিয়াই সমীরণ চলিয়া গেল, আর একমুহূর্ত্ত দাঁড়াইতে সাহস করিল না।

ধীরে-ধীরে সমীরণের পদশব্দ মিলাইয়া গেল। মক্ষি সেদিকে না চাহিয়াও বুঝিল, সমীরণ চলিয়া গেছে। তথাপি তাহার ঘোর কাটিতে চাহিল না।

বহুক্ষণ পরে সে যখন মাথা তুলিল, তখন তার চোখের পাতা ভারি হইয়া উঠিয়াছে, ভালো করিয়া মেলিতে পারে না। চারিদিকে একবার চাহিয়া দেখিল। সমীরণ নাই, তবু ভয় গেল না। কিছুক্ষণ পরে সমীরণের পাতের উপর দৃষ্টি পড়িল। দেখিল, কিছুই খাওয়া হয় নাই, সবই প্রায় পড়িয়া আছে। কিন্তু তার জন্য তাহার বুকের ভিতরটা মোচড় দিয়াও উঠিল না, চোখ ফাটিয়া দরদর-ধারে অশ্রুও গড়াইয়া পড়িল না। বুকের ভিতরটা তাহার এমন করিয়া টিপ্ টিপ্ করিতেছিল যে, আর সমস্ত অনুভূতিই যেন নষ্ট হইয়া গিয়াছিল।

সে ধীরে-ধীরে সমীরণের চায়ের বাটি ও খাবারের রেকাবী রান্নাঘরে লইয়া আসিল। উনানে গম্ গম্ করিয়া

কয়লা জ্বলিতেছিল। কিন্তু শুধু নিজের জন্য রাঁধিতে তাহার ইচ্ছা করিল না। উনানের আগুন নিভাইয়া, রান্নাঘরের শিকল টানিয়া দিয়া সে সমীরণের ঘরে আসিল, বোধ হয় 'পল্লীসমাজ' খানি যথাস্থানে রাখিয়া দিতেই। কিন্তু কি ভাবিয়া অলসভাবে সমীরণের বিছানায় শুইয়া পড়িয়া বইখানির পাতা উল্‌টাইতে লাগিল ;—

সত্যবতী জানে, সমীরণ মক্ষির স্বামী। মক্ষি আপন মনেই একটু হাসিল। এখানে সবাই তাই জানে, সেইরকমই জানানো হইয়াছে। না জানাইলে কি রক্ষা ছিল! শত কৌতূহলী চক্ষু প্রচুর অধ্যবসায়ের সঙ্গে এই দিকে ধাবিত হইত।

কিন্তু কথাটা মিথ্যা তো নয়। সমীরণই তো তাহার স্বামী। মন্ত্র পড়ে নাই, বিবাহও হয় নাই, কিন্তু সুদীর্ঘ দিনের একত্রবাসে যে একে অন্যের মন জয় করিয়াছে ইহা তো সত্য।

মক্ষি পাশ ফিরিয়া শুইল। বইখানি পিছনে পড়িয়া রহিল।

এই শয্যাই তাহার সত্যকার শয্যা। ইহার উপর তাহার অধিকার আছে। সে অধিকার সে যদি প্রতিষ্ঠিত করে কেহ বাধা দিতে পারে না। লজ্জা? হ্যাঁ, লজ্জা একটু করে বই কি! মেয়েদের লজ্জা করিবে না? কিন্তু—

মক্ষির সমীরণের উপর রাগ হইল।

—সমীরণের অত লজ্জা কেন? সে কি কিছুই বুঝিতে পারে না? সে কি ভাবিয়াছে, মক্ষি নিজে হইতে তাহার বাহুতে ধরা দিবে? তা কি হয়? মেয়েরা কখনও উপযাচিকা হইয়া ধরা দিতে পারে?

কিন্তু সমীরণ অমনিই চিরদিন। কোথাও কাহারও উপর জোর খাটায় না,—কোথাও নিজের জোরে নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহে না। অন্তরের সমস্ত বেদনার বিরুদ্ধে একাকী অতি গোপনে সে সংগ্রাম করিবে, তবু মুখ ফুটিয়া কাহারও অনুগ্রহ ভিক্ষা করিবে না,—অমনিই চিরদিন।

তাও তো করিয়াছে। কতদিন কতভাবে আপনার অন্তরের কথা নিবেদন করিতে বাকী তো রাখে নাই। সে-ই সাড়া দিতে পারে নাই।

বইখানি পিঠের নীচে পড়িয়া যাওয়ায় মক্ষির কেমন অস্বস্তি লাগিতেছিল। বাঁ হাত দিয়া বইখানা তুলিয়া সুমুখে আনিল এবং অনাবশ্যক ভাবে আবার তাহার পাতা উল্‌টাইতে লাগিল।

কিন্তু তাই কি কোনো মেয়ে পারে? সে তো কখনও প্রত্যাখ্যান করে নাই। কখনও তো বলে নাই, সমীরণ,

এ তোমার অন্যায় স্পর্দ্ধা! আবার কি করিয়া সে মনের কথা প্রকাশ করিতে পারে? এই কি যথেষ্ট নয়?

সত্যবতীর ছেলে দুটি বেশ। অমন ছেলে যে-কোনো মায়ের কাছে ঐশ্বর্য্য। ছেলেদের ছেলেমি ভারি সুন্দর!

দিবাকর-প্রভাকরের দ্বিপ্রহরের কাণ্ড মনে করিয়া অজ্ঞাতেই মক্ষির ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা খেলিয়া গেল।

বেশ আছে সত্যবতী। অমনি সুন্দর দুটি ছেলে দিন-রাত্রি পায়ে-পায়ে ফিরিলে কাজ করিতেও আনন্দ লাগে। তার স্বামীকে মক্ষি দেখে নাই। তবু মনে হইল, স্বামীর প্রেমে মেয়েটি বিভোর হইয়াই আছে।

সত্যবতী ঠিকই বলিয়াছে। অঙ্ক কষিয়া, চুল চিরিয়া অধিকার বিভাগ করিয়া হয়তো ঘর করা যাইতে পারে, কিন্তু ভালোবাসা যায় না। স্বামীর স্ত্রীর উপর ঠিক কতখানি অধিকার থাকিবে, কোথায় তাহার সীমারেখা, সে সীমারেখা অতিক্রম করিলে স্বামীকে কি ভাবে শাস্তি দেওয়া যাইতে পারে, এ তর্ক আর যারই মনে উঠুক প্রণয়িণীর মনে ওঠে না। ওঠে তখনই যখন প্রেম শিথিল হইয়া আসে। তখন অতি তুচ্ছ কারণকে উপলক্ষ করিয়া উভয়ের মধ্যে ঝগড়া হয়, আর তারই ঢেউ খবরের কাগজে পর্য্যন্ত ফেনিয়ে ওঠে।

দোষ-ত্রুটি, ভুল-ভ্রান্তি মানুষের হয়। কোনো দিন কোনো ত্রুটি করিবে না এমন গ্যারাণ্টী দিয়া কে মাল্যদান করিতে পারে? সে ত্রুটি ক্ষমা করা ছাড়া উপায় কি? যার প্রেম যত বড়, তার ক্ষমা করিবার শক্তিও তত বড়।

কিন্তু বিবাহকে সে কোনো মতেই বড় আসন দিতে পারে না। ওটা একটা অনুষ্ঠান মাত্র, যার কোনো প্রয়োজনই নাই। কিছু প্রয়োজন যদিই বা থাকে তা অতি সামান্য। 'আমি তোমায় ভালোবাসি,' এই কথাটাই সব চেয়ে বড়। অগ্নি সাক্ষী করিয়া শপথ করা নিষ্প্রয়োজন এবং আদালতে গিয়া রেজেষ্ট্রি করা প্রেমের অপমান।

মানুষের জীবনে ভালোবাসিতে পারার চেয়ে সার্থকতা আর আছে? অথচ, ইহারই জন্য কত লজ্জা, কতই না সঙ্কোচ!

ঠিক এমনি সময়ে বাহিরে সমীরণের পদশব্দ পাওয়া গেল। এবং যে লজ্জা ও যে সঙ্কোচকে মক্ষি এই মাত্র আপনার মনে ধিক্কার দিতেছিল, তাহাই তাহাকে এমন করিয়া পাইয়া বসিল যে, সমীরণের অতর্কিত আগমনে কি করিবে ভাবিয়া না পাইয়া তাড়াতাড়ি পাশের চাদরটা টানিয়া আপাদমস্তক মুড়ি দিয়া এক কোণে জড়-সড় হইয়া শুইয়া পড়িল।

বন্ধনী

সমীরণেরও বুকের মধ্যে যেন আগুন জ্বলিতেছিল। মক্ষির একান্ত সন্নিকটে দাঁড়াইয়াও সে যে কি করিয়া আপনাকে সম্বরণ করিয়াছে সে কথা সে ভিন্ন আর কেহ বুঝিবে না। কিন্তু ধাক্কাটার ওইখানেই শেষ হয় নাই।

সমস্ত পথ এবং নিমন্ত্রণ বাড়ীতে বসিয়াও তাহার কেবলই মনে হইতেছিল, এমন করিয়া আর কতদিন তিল তিল করিয়া নিঃশব্দে নিজেকে দগ্ধ করিবে সে? এত বড় বিড়ম্বনা আর কতদিন সহা যায়? আজ সে দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়া আসিয়াছে, মক্ষির কাছে স্পষ্ট কথা শুনিয়া লইবে। তারপর? তারপর অনন্ত পৃথিবী এবং অনন্ত কাল সুমুখে পড়িয়া আছে। তারই মধ্যে সে কি নিজেকে নিশ্চিহ্ন করিয়া দিতে পারিবে না?

এত বড় সঙ্কল্প লইয়াই সে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। এবং প্রবেশ মাত্র চোখে পড়িল, মক্ষি আপাদমস্তক আবৃত করিয়া তাহারই শয্যার এক প্রান্তে কাঠ হইয়া শুইয়া আছে।

সঙ্কল্পের দৃঢ়তা এক নিমিষে কোথায় উড়িয়া গেল। অজানা আশঙ্কায় তাহার বুক দুরু দুরু করিয়া উঠিল,—মক্ষি কি অসুস্থ?

ছুটিয়া আসিয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়া সে মক্ষির ললাটে হাত দিল,—উত্তাপ স্বাভাবিক।

কিন্তু মক্ষির স্পর্শে কিছু বুঝি ছিল। (তারপরে কি হইল তাহা সমীরণও বুঝিতে পারিল না। যখন বুঝিল, তখন একই শয্যায় দু'জনে গাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ।) ধীরে ধীরে সমীরণ একবার চোখ মেলিয়া চাহিল এবং মক্ষির কানের কাছে মুখ লইয়া অতি অস্ফুট স্বরে কহিল,—এই দিনটির জন্যে কত যুগ থেকে অপেক্ষা কোরে আছি।

মক্ষি কিন্তু চোখ মেলিতে পারিল না। তাহার সর্ব্বাঙ্গ আরও সঙ্কুচিত হইয়া আসিল। শুধু ঠোঁট দুটি একবার কাঁপিয়া উঠিল। বুঝি বলিতে চাহিল,—আমিও।

কিন্তু পারিল না।

সূর্য্যমুখী

ইহার পরে কেমন করিয়া যে দুটা বছর চোখের পলকে কাটিয়া গেল তাহা কেহ টেরই পাইল না। অনেক পরি-বর্ত্তনই ইতিমধ্যে ঘটিয়া গেছে। তন্মধ্যে সব চেয়ে উল্লেখ-যোগ্য ঘটনা, ইহারা অচিরেই একটি নূতন অতিথির আগমন সম্ভাবনায় পুলকিত হইয়া উঠিয়াছে। আজকাল এই ভাবী শিশুটিই সকল প্রসঙ্গের মূল উৎস।

সমীরণের দিকে সুমুখ ফিরিয়া নূতন সেক্রেটারিয়েট টেবিলে ঠেসান দিয়া মেঝেয় বসিয়া মক্ষি একমনে সেলাই করিতেছিল। অকস্মাৎ কি কথা মনে পড়ায় সে বলিল, —ওগো শুনছ?

সমীরণ খাটের উপর শুইয়া একখানা নভেল খুলিয়া পড়িতেছিল,—অর্থাৎ তাহার ফাঁক দিয়া একদৃষ্টে মক্ষির পানে চাহিয়াছিল। সে হাসিয়া বলিল,—না।

মক্ষি হাতের সেলাই মাটিতে রাখিয়া সমীরণের খাটে আসিয়া বসিল এবং তার হাতের বইখানি ছুঁড়িয়া টেবিলের

উপর ফেলিয়া দিয়া বলিল,—সত্যবতী কি বলছিলো জানো ?

সমীরণ অবিচলিতভাবে বলিল,—জানি।

সমীরণ যে কিছুই জানে না, তা মক্ষি বেশ জানে। রাগিয়া বলিল,—তুমি তো সবই জানো। বলো তো কি বলছিলো ?

—বলছিলো তোমার খোকা হবে।

সমীরণের সম্বল যে শুধু অনুমান তাহা মক্ষি বুঝিল। একটু হাসিয়া তার গাল টিপিয়া দিয়া বলিল,—সব জানে।

সমীরণ হাসিয়া বলিল,—সব জানি, বোমা তৈরী করা থেকে কাপড়ের দোকান করা পর্য্যন্ত।

বোমা তৈরীর কথায় মক্ষির অনেক কথা মনে পড়িয়া গেল। বলিল,—আচ্ছা, আমার অনেক পরিবর্ত্তন হয়েছে, না ? তুমি ছিলে, যেদিন আমি আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট পোষ্টাফিস লুট কোরে নিয়ে আসি ? উঃ ! এখন আর পারিনে বোধ হয়।

সে একবার আপনার হাতের পেশীগুলি দেখিল,—কিছু নাই, সব ঢিলা হইয়া গেছে।

পাশ বালিশটা টানিয়া লইয়া সমীরণের পা-তলার দিকে কাৎ হইয়া শুইয়া পড়িয়া মক্ষি বলিল,—চুলোয় যাক্। আর পেরেও কাজ নেই।

সমীরণ ব্যস্ত হইয়া সরিয়া গিয়া বলিল,—ওকি, পা-তলার দিকে কেন?

মক্ষি পা-তলার দিকে আর একটু আরাম করিয়া শুইয়া বলিল,—একটু পুণ্য সঞ্চয় কোরে নিচ্ছি। তুমি হোলে পতিদেবতা।

সমীরণ বিব্রতভাবে বলিল,—তা কি কোনো দিন বলেছি?

—তুমি কেন বলবে? আমার স্বার্থের খাতিরে আমি বলছি। আমি দেখলাম, অন্দরে বসে-বসে তোমার উপার্জ্জনের অর্থে খাওয়া বেশ আরামজনক। বললাম, তুমিই আমার একমাত্র দেবতা, আমার ইহকাল-পরকাল, আমার সর্ব্বস্ব। তুমি দেখলে, এ অতি সত্য কথা। আমি কুঞ্জবনে পদ্মপত্রের ওপর শুয়ে বিরহ যাপন করতে লাগলাম। তুমি বন থেকে ফল এনে আমায় খাওয়ালে, ঝর্ণা থেকে অঞ্জলি-অঞ্জলি জল এনে নিজের হাতে আমায় পান করালে, গাছ থেকে পাতা এনে আমার জন্যে কুটির তৈরী করলে, এবং তারপরে তোমার গৃহলক্ষ্মীর পাহারায় কুটিরদ্বারে দিবারাত্রি ধনুর্ব্বাণ হাতে জেগে বসে রইলে। এর পরেও তোমাকে পতিদেবতা বলবো না?

সমীরণ উত্তেজিতভাবে উঠিয়া বসিয়া বলিল,—তুমি

আমায় ঠাট্টা করছ? কিন্তু আমি তো তোমাকে কোনো দিন অসম্মান করি নি।

সমীরণের উত্তেজনা দেখিয়া মক্ষি একটু গম্ভীর হইল। বুঝিল, কথাটা সমীরণকে ব্যথা দিয়াছে। অসীম সোহাগে ডান হাতখানি তার কোলের উপর ফেলিয়া দিয়া মক্ষি ঢিমা তালে বলিতে লাগিল,—একটু হয়তো পরিহাস করেছি, কিন্তু সবটা মিথ্যা নয়। মেয়েদের প্রেম হচ্ছে লতার প্রেম, একটা বড় গাছকে না জড়িয়ে ধরে সে দাঁড়াতে পারে না। বুকে হাত দিয়ে বলতো, তুমি চাও না সেবা, চাও না ভক্তি, চাও না আমার অধীনতা?—না, না, সত্য কথাকে বেঁকিয়ে লাভ নেই। দু'বছর ধরে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে তোমাকে পরীক্ষা কোরে বুঝেছি, তুমি এই সবই চাও। এ তোমাদের প্রবৃত্তি। এ তোমাদের পেশীবহুল বলিষ্ঠ দেহের ধর্ম্ম। তোমাদের কোনো হাত নেই। এমন কি, এর জন্যে তোমাদের কিছুমাত্র লজ্জিত হবারও কারণ নেই।

দম লইবার জন্য মক্ষি একটু থামিল।

তারপরে বলিল,—আর আমাদের ঠিক তার উল্টো। কোমল দেহ এবং কোমলতর মন নিয়ে আমরা তোমাদের কাছ থেকে আদর চাই, সোহাগ চাই এবং এরই জন্যে কত

কৌশলই জন্ম থেকে আয়ত্ত কোরে ফেলি। আমার সোহাগ-নিবেদন দেখে মাঝে-মাঝে তুমি অবাক হ'য়ে চাও, সে আমি জানি। তুমি ভাবো, এত কৌশল এ শিখলো কোথায়? কিন্তু হাঁসের ছানাকে সাঁতার শেখবার জন্যে কি সাঁতার-ক্লাবের মেম্বার হ'তে হয়? আমরা সোহাগ চাই, আদর চাই আর তারই লোভে তোমাদের সেবা করি, শুশ্রূষা করি, তোমাদের পায়ের তলায় মাথা লুটিয়ে দিই—তোমাদের বলি পতি-দেবতা।

—শুধু লোভে? অন্তরের কোনো প্রেরণা নেই?

মক্ষি হাসিয়া বলিল,—অন্তরের প্রেরণাই তো লোভ জাগায়। তোমাদের সেবা কোরে আমাদের আনন্দ হয়। সে আনন্দ আমাদের সমস্ত কাজে ছিট্‌কে ওঠে দেখতে পাও না?

সমীরণ কহিল,—কিন্তু আমরা, আমরা কি তোমাদের সেবা করিনে, শুশ্রূষা করি নে, তোমাদের পায়ের তলায় মাথা রেখে বলিনে, 'স্মর গরল খণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং দেহি পদপল্লবমুদারম্'?

মক্ষি হাসিয়া বলিল,—বলো। কিন্তু তার মধ্যে ভক্তি থাকে না, থাকে স্নেহ, থাকে অনুকম্পা। ও হচ্ছে সোহাগ জানাবার একটা নতুনতরো ভঙ্গি। কেমন জানো? মা

ছেলেকে মাথার ওপর তুলে নাচিয়ে সোহাগ জানান, তাতে ছেলেরও মর্য্যাদা বাড়ে না, মায়েরও আসন ছোট হয় না। ও শুধু সোহাগ জানাবার একটা ভঙ্গি। কিন্তু আমরা যে তোমাদের পায়ের তলায় মাথা রাখি, সে সোহাগ জানাতে নয়, পূজো কোরতে।

সমীরণ তাহাকে একটা ঠেলা দিয়া বলিল,—যাও, তুমি অতি সেকেলে হ'য়ে পড়েছ।

—সেকেলেই তো। কিন্তু আজকে যে মত পুরোনো, পাঁচশো বছর পরে সেইটেকেই নতুন মত বোলে আজকের মতোই তারা লাফালাফি কোরবে। পৃথিবীর মতবাদ, রাষ্ট্রীয়ই বলো, আর সামাজিকই বলো, ঘড়ির কাঁটার মতো একের ঘর থেকে লাফাতে-লাফাতে বারোর ঘরে আসে, আবার সেখান থেকে লাফিয়ে একের ঘরে পড়ে।

সমীরণ বাধা দিয়া বলিল,—তা পড়ুক। কিন্তু তোমার মতো শিক্ষিতা মেয়েও যদি আজকের এই নারী-জাগরণের দিনে—

—রাখো, রাখো, তোমার নারী-জাগরণের দিন। ওটা ছেলেদের একটা চাল, আর মেয়েরা না বুঝে তাতে লাফিয়ে পড়ছে। ওর মানে যে কি, সে আমি বুঝে নিইছি।

—কি বুঝে নিয়েছ তুমি ?

—বুঝেছি, নারী জাগরণ না হ'লে তিরিশ টাকায় আর কুলোয় না। দেখ্‌ছি তো, বি-এ,-এম-এ, পাশ কোরে তিরিশ টাকার জন্যে ঝুলোঝুলি। সেই তিরিশ টাকাও পায় যাদের কপালের জোর খুব বেশী। সে ক্ষেত্রে নারী-জাগরণ না হ'লে শতকরা নব্বুই জনকে সন্ন্যাসী হ'য়ে থাকতে হয়। মক্ষি হাসিতে লাগিল।

সমীরণ উত্তেজিতভাবে বলিল,—বেশ তো, তাই না হয় সত্যি হোল। কিন্তু তাতেই বা ক্ষতি কি?

—ক্ষতি তোমাদের তো নয়, ক্ষতি আমাদের। আমাদেরই এই সুখের ব্যবসা নষ্ট হ'য়ে যাবে। দিব্যি পায়ের ওপর—

বাধা দিয়া সমীরণ বলিল,—আর এই যে সব অত্যাচার হচ্ছে,—অমানুষিক নির্য্যাতন, নৃশংস প্রহার—

মক্ষি জোরে হাসিয়া উঠিল—থামো, থামো, সে অত্যাচার তুমি ঠেকাবে কি দিয়ে?

—কেন, নারী-জাগরণ যদি হয়—

—কিচ্ছু হবে না। ইউরোপের যে কোনো দেশের খবরের কাগজগুলো একবার পড়, দেখবে সেই নারী-জাগরণের দেশেও প্রত্যহ কি অত্যাচার হচ্ছে। ওগো দয়ার সাগর, পুরুষের গায়ের জোর যতদিন বেশী থাকবে ততদিন ও অত্যাচার চলবেই। ওর প্রতিকার নেই। ওর জন্যে মাথা

খারাপ না কোরে তুমি বরং দোকানে গিয়ে বোসো গে, আমিও ও-বাড়ী থেকে একটু ঘুরে আসি।

বলিয়া দরজার কাছ পর্য্যন্ত গিয়া আবার কি ভাবিয়া ফিরিয়া আসিয়া হাসিতে-হাসিতে বলিল,—কিন্তু মারটা শুধু তো মার নয়, শাসনও। ওর যে অংশ পিঠের ওপর পড়ে সে অংশ দাগ বসায়। কিন্তু এখানে এসে অনেক মেয়েই তো দেখলাম, মনে তো হোল না যে, মনের ওপর ওর কোনো স্থায়ী দাগ বসে।

সমীরণের আরও একটু কাছে গিয়া মক্ষি টিপিয়া-টিপিয়া হাসিতে-হাসিতে বলিল,—খুন এবং ডাকাতির অন্তত পাঁচটা ওয়ারেণ্ট আমার নামে তো ঝুলছে, আমারই মনে হয়, একটু-আধটু তোমার হাতের মার বোধ হয় আমিই সইতে পারি।

বলিয়া মক্ষি আর এক সেকেণ্ড না দাঁড়াইয়া সমীরণের মাথায় একটা ঝাঁকি দিয়া বাহির হইয়া গেল।

মক্ষি যেন অনেকটা বাচাল হইয়াছে,—কথা বড় বেশী বলিতেছে। বিপ্লবীদলের যখন সে নেত্রী ছিল, তখন অবশ্য কথা কম বলিত না। বরং একটু কথা বেশী বলাই স্বভাব।

কিন্তু মধ্যে যেন একেবারে চুপ হইয়া গিয়াছিল। সর্ব্বদাই যেন একটা কিছু ভাবিত। সমীরণ কাছে আসিলেই কেমন একটু সঙ্কুচিত হইয়া থাকিত।

এখন সে সঙ্কোচের চিহ্নমাত্র নাই। বরং সে-ই দিনের মধ্যে দশবার সমীরণকে ঠেলা দিয়া, নাড়া দিয়া, হাসাইয়া, অনাবশ্যক বকাইয়া অস্থির করিয়া তুলিত।

রাত্রে ঘুম তো নাই। সমীরণ বেচারা সমস্ত দিন দোকান করিয়া এবং এখান-ওখান ঘোরা-ঘুরি করিয়া ক্লান্ত হইয়া ফিরিত। কিন্তু চোখের পাতা বুজিবার উপায় কি? মক্ষি খাওয়া-দাওয়া সারিয়া, খাটের উপর আসর জমাইয়া বসিয়া বলিত,—এই যে, ঘুমুতে দিচ্ছি দাঁড়াও।

ঘুমের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পন্ন হইত। সমীরণ চোখ মেলিয়া উপরের দিকে চাহিয়া নূতন একটা গাঁজার দোকান খুলিবার উপায় চিন্তা করিত, আর মক্ষি কোথাকার কথা কোথায় টানিয়া আনিয়া অনর্গল বকিয়া যাইত এবং একবার করিয়া টান খোঁপা ঢিল করিত আর একবার ঢিল খোঁপা টান করিত। তারপর হঠাৎ এক সময় বলিত,—আচ্ছা, ঘুমোও। এবং সমীরণ পাশ ফিরিয়া শুইতে-না-শুইতে মক্ষি পাঁচ মিনিটের মধ্যে অঘোরে ঘুমাইয়া পড়িত।

মাঝে মাঝে সমীরণের অমনোযোগিতা ধরাও পড়িয়া

যাইত। তখন তার আর লাঞ্ছনার সীমা থাকিত না। মুখখানি গম্ভীর করিয়া আপাদমস্তক কাপড় ঢাকা দিয়া মক্ষি ও-পাশ ফিরিয়া শুইয়া পড়িত। আর হাতে ধরিয়া, বিনয় করিয়া, ক্ষমা চাহিয়া, হাসাইবার চেষ্টা করিয়া সমীরণ যখন কোনো প্রকারেই ক্ষমা পাইত না, তখন অগত্যা বাধ্য হইয়া ক্ষুণ্ণমনে সে শুইয়া পড়িত।

কিন্তু এক মিনিট যাইতে না যাইতেই ও-পাশের ক্রুদ্ধ ব্যক্তিটি একটু অতিরিক্ত রকম সশব্দে নড়িয়া চড়িয়া এ-পাশ ফিরিত এবং সমীরণকে একটা ঠেলা দিয়া বলিত,—ঘুমুচ্ছ যে বড়!

—তবে কি করবো? সমস্ত রাত খাটের ওপর 'নাড়ু-গোপাল' হ'য়ে বসে থাক্‌বো?

মক্ষি খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিত, বলিত,—হ্যাঁ, তাই থাকতে হবে। থাকোনা গো, থাকোনা। ওঠো—

তাহার ঠেলাঠেলিতে অস্থির হইয়া সমীরণ সজোরে তাহাকে বুকে চাপিয়া ধরিত। অমনি ঝড়ের সময় তেল ঢালিয়া দিলে বিক্ষুব্ধ সমুদ্র যেমন শান্ত হইয়া পড়ে, মক্ষি তেমনি এক মিনিটের মধ্যে শান্ত হইয়া তার বুকের মধ্যে এলাইয়া পড়িত। গভীর সুখে চোখ বুজিয়া আসিত।

সমীরণ এখন আর তাহাকে মক্ষি বলিয়া ডাকে না। কখনো বলে বিদ্যুৎ, কখনো বলে লতা।

বিদ্যুৎ হাসে, বলে,—কেন, মক্ষি নই কেন ?

সমীরণ বলে,—না, মক্ষি নও। মক্ষিরাণীর সহস্র দাস মৌমাছি থাকে। আজ কিন্তু তুমি একান্ত কোরে শুধু আমারই।

সমীরণ তাহাকে কাছে টানিতে যায়। হাত ছাড়াইয়া লইয়া বিদ্যুৎ বলে,—এইতো, এইতো, এখন থেকেই একচেটিয়া অধিকার স্থাপন আরম্ভ হোল ?

সে পরিহাস সমীরণ গায়ে মাখে না। বলে,—হ্যাঁ হোল। তাতে কি ?

বিদ্যুৎ বলে,—তাইতো। ছিলাম রাণী, হলাম দাসী। কিন্তু তাতেও তৃপ্তি হোল না, এখন কোরতে চাও ক্রীতদাসী।

সমীরণ হাসিয়া বলে,—তারও চেয়ে বেশী। ক্রীতদাসীকে লোকে বিক্রী কোরতে পারে, তোমায় আমি তাও পারবো না।

—পারবে না ?

—না।

কিছুদিন হইতেই বিদ্যুতের মনে একটা খট্‌কা লাগিয়াছে। তার মনে প্রশ্ন জাগিয়াছে,—সমাজে তার ভাবী সন্তানের [স্থা]ন কোথায়।

বিবাহকে সে চিরদিনই একটা অপ্রয়োজনীয় অনুষ্ঠান বলিয়া মনে করিয়া আসিয়াছে। আজও সে মত শিথিল হয় নাই। কিন্তু এতদিন বিবাহকে সে দু'জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। দুটি নর-নারীর মধ্যে প্রেমের নির্ঝর যেখানে স্বতঃই উৎসারিত হইয়া ওঠে, সেখানে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা অশোভন। কিন্তু দুটি নর-নারীর মধ্যেই তো বিবাহের সমাপ্তি নয়। তাহাদের কল্যাণে, তাহাদের প্রেমে, তাহাদের পুণ্যে আরও বহু অতিথি এ সংসারে আসিবে। জনক-জননীর প্রেমের প্রতি তাহাদের যত বড়ই শ্রদ্ধা থাক, এবং যত বড় সত্যের মধ্যেই তাহাদের জন্ম হইয়াছে বলিয়া বিশ্বাস করুক, লোকসমাজে মুখ নামাইয়া চলিতে হইলে তাহারা জনক-জননীকে ক্ষমা করিতে পারিবে না।

সমাজ একটা আছে। সে সমাজ ভালো হোক, মন্দ হোক, অত্যন্ত জরাজীর্ণ হোক, বাণপ্রস্থ না লইলে, তাহার অনুশাসন না মানিয়া উপায় নাই। এই অতি বৃদ্ধ অন্ধ-সংস্কারাচ্ছন্ন সমাজের মধ্যে তাহার ভাবী শিশুটিকে কল্পনা করিয়া বিদ্যুতের দুশ্চিন্তার আর অন্ত নাই।

অথচ, বিবাহ করিয়া বাঁধনটাকে আর এক দফা পাক করিয়া লইবারও উপায় ছিল না। তাহাদের আগমনকা[illegible]

হইতে এখানকার সকলেই জানে তাহারা বিবাহিত দম্পতি। তাহাদের চোখের সুমুখে নিজেদের মিথ্যাভাষণ স্পষ্ট করিয়া ধরিয়া দিবার সাহস হয় নাই। তাও বটে, আবার এখন যে সমস্ত প্রশ্ন উঠিয়াছে তখন সে সমস্ত প্রশ্ন উঠিবার অবসরই পায় নাই।

অথচ এই সমস্ত প্রশ্ন সমীরণের সম্মুখে উত্থাপন করিতেও সঙ্কোচ হয়। আপনার মনের মধ্যেই পুষিয়া রাখে। তার বসন্তকে ক্ষণে ক্ষণে মনে পড়ে। মনে পড়ে, মুখখানি কাঁচুমাচু করিয়া কেমন ভাবে সে তাহার কাছে-কাছে ঘুরিত। তাহারই পাশে আপনার অজাত সন্তানের মুখখানি কল্পনা করিতেও সে শিহরিয়া ওঠে।

সমীরণের কথার উত্তরে সে তাহার পানে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হানিয়া বলিল,—কিন্তু যদি আমায় ত্যাগই করো, আমি কি কোরতে পারি ?

বিদ্যুতের মনের এই চাঞ্চল্যের খবর সমীরণ রাখিত না। সে হাসিয়া বলিল,—তাহোলে তুমিও আমায় ত্যাগ করবে।

এ উত্তরে বিদ্যুৎ সন্তুষ্ট হইতে পারিল না। একটু শীর্ণ হাসি হাসিল মাত্র। কিন্তু কোনো তর্ক করিল না, কিম্বা তাহার মনের ব্যথা কোথায় তাহাও জানাইবার চেষ্টা করিল না।

সমীরণ তাহাকে কাছে আকর্ষণ করিয়া বলিল,—এ আর ভালো লাগে না, বিদ্যুৎ,—চল অন্য কোথাও যাই।

বিদ্যুৎ হাসিয়া বলিল,—কোথায় যাবে?

—যেখানে হয়। এ কাপড়ের দোকান আর ভালো লাগে না। বরং চল, আবার তেমনি কোরে বনে-জঙ্গলে ঘুরি। তেমনি কোরে আমলকী গাছের ছায়ায় তুমি আমার কোলের ওপর মাথা রেখে নিদ্রা যাবে, আর আমি সমস্ত রাত নির্নিমেষে তোমার মুখের পানে চেয়ে থাকবো। আর দিনের বেলায় ছায়ায় ঢাকা বন পথে-পথে দু'জনে শুধু ঘুরে বেড়াবো,—শুধু দু'জনে,—তুমি আর আমি। যাবে?

বিদ্যুতের যে লোভ হইতেছিল না, তা নয়। কিন্তু সে লোভ সম্বরণ করিয়া বলিল,—বেশ। আর যে তৃতীয় ব্যক্তি আসছে, সে?

তাহার কথা সমীরণের মনেই আসে নাই। বলিল,—সে-ও সঙ্গে থাকবে,—কখনো তোমার কোলে, কখনো আমার কোলে।

এবারে বিদ্যুৎ গম্ভীর হইয়া বলিল,—তা হয় না। আমরা পারি, কিন্তু সে তা পারবে না। তার জন্যে তোমাকেও দোকান কোরতে হবে, আমাকেও সংসারের কাজে উদয়াস্ত পরিশ্রম কোরতে হবে। তার জন্যে বাড়ী চাই,

টাকা চাই, আরও যা-যা কিছু মানুষের দরকার তাও চাই।

সমীরণ পরিহাস করিবার চেষ্টা করিয়া বলিল,—সম্ভব হোলে একখানা মোটরও চাই।

কিন্তু সে পরিহাসে বিন্দুমাত্র যোগ না দিয়া মক্ষি বলিল,—হাঁ, সম্ভব হোলে একখানা মোটরও চাই।

তার মুখের পানে চাহিয়া সমীরণ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল—তা ঠিক।

দিন কয়েক পরে।

এক সুপ্রভাতে সমীরণ আসিয়া জানাইল, গাঁজার দোকানটি পাওয়া গেছে।

সুখবর সন্দেহ নাই। সহরটি ছোট হইলেও গাঁজার দোকানে বিক্রী বড় কম হয় না। সেজন্য প্রতিবারই এই দোকানটির লোভে যত প্রার্থী আসিয়া উপস্থিত হয় তাহাদের সংখ্যা বড় কম নয়,—এবারেও গুজরাটি, মারাঠি, মাদ্রাজী, এমন কি একটি যূথভ্রষ্ট পার্শী পর্য্যন্ত ছিল। তাহার মধ্যে এই দুর্ব্বল এবং অতি অসহায় বাঙালীটির পক্ষে পথ করিয়া

লওয়া বড় চারিটিখানি কথা নয়। কিন্তু বড়বাবু সহায় থাকিলে কি না হয়?

তথাপি বিদ্যুৎ যেন এ সংবাদে ততটা সুখী হইতে পারিল না। বিদ্যুৎ শেলী পড়িয়াছে, কীট্‌স্ পড়িয়াছে, সুইন্‌বার্ণ পড়িয়াছে, তার উপর মেয়েমানুষ,—অর্থাৎ এক কথায় ভদ্রমহিলা বলিতে যা বোঝায় তাই। পেটের দায়ে গাঁজার দোকান করায় তার মন তেমন সায় দিতে পারিল না।

শুধু বলিল,—বেশ।

সমীরণ উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিল,—শুধু বেশ? মাসে তিনশোটি টাকা ফেলে-ছড়ে। এর আর মার নেই। বুঝলে, বিদ্যুৎবরণী?

সম্বোধনের বাহার এবং বহর দেখিয়া বিদ্যুৎ না হাসিয়া পারিল না। একটু দ্বিধার ভঙ্গিতে সে বলিল,—কিন্তু শেষটায় গাঁজার দোকান?

—তাতে কি? গাঁজা খাবো না তো, বিক্রী কোরব। তাতে দোষটা কি শুনি?

কিন্তু শুনিবার কোনো আগ্রহ না দেখাইয়াই সমীরণ বলিল,—লতা, তোমার ছেলের জন্যে একটি মোটর আসছে বারে নিও। ব্যস্।

ছেলের মোটরের সম্ভাবনায় বিদ্যুৎ হাসিয়া উঠিল। এমন কি, গাঁজার দোকানের দ্বিধাও যেন তিরোহিত হইল।

সমীরণ বলিতে লাগিল,—আর ছেলের মায়ের জন্যে —ছেলের মায়ের জন্যে—

কিন্তু ছেলের মায়ের জন্য দিবার মতো জিনিস হাতের কাছে না পাইয়া সমীরণ বলিল,—ছেলের মায়ের জন্য কি বলো তো?

মক্ষি হাসিয়া বলিল,—একটা হাতী।

সমীরণ বিরক্তির ভাণ করিয়া বলিল,—না, না, হাতী না,—হাতী আবার কি হবে? বলো না গো, ছেলের মায়ের জন্যে কি দেওয়া যায়?

দীর্ঘ দেহলতা তরঙ্গের মতো দুলাইতে-দুলাইতে কাছে আসিয়া বিদ্যুৎ বলিল,—বলবো?

—বলো।

সমীরণের কাণের কাছে মুখ লইয়া গিয়া বিদ্যুৎ দুটি অক্ষরের একটা কথা বলিয়াই চকিতে দূরে সরিয়া আসিয়া হাসিতে লাগিল।

তাহাকে ধরিতে না পারিয়া অপ্রস্তুত ভাবে সমীরণ বলিল,—কিন্তু তার জন্যে গাঁজার দোকান করার দরকার কি? সে তো—

সমীরণ গম্ভীর হইয়া বলিল,—তুমি সত্যি বলেছ লতা, এ জীবনে আমার কাছে তোমার এবং তোমার কাছে আমার এর চেয়ে চাইবার জিনিস আর কিই বা আছে? কিন্তু সে কথা কি বুঝি? কেবলি নিজেকে ক্ষিণ্ণ করি, ক্লিষ্ট করি, হাঁফিয়ে তুলি,—যেন বলতে চাই, দেখ, তোমার জন্যে কতই আমি সইছি। এই পুরুষের প্রেম। এর সমস্ত ফাঁক অহঙ্কারের রসে ভরা। পৃথিবীর বুক ফাটিয়ে, সমুদ্রের তলা ঘেঁটে সে রত্ন তোলে শুধু প্রিয়ার গলার মাল্য রচনার জন্যে। এই পুরুষের প্রেম!

সমীরণ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া শূন্যপ্রেক্ষণে বাহিরের পানে চাহিয়া রহিল।

প্রিয়ের ঠোঁঠে যে এত মধু তাহা মক্ষিও সবে জানিয়াছে। সুদীর্ঘ বিপ্লবী জীবনে এ ক্ষুধা তাহার মনে বাসা বাঁধিবার অবসরই পায় নাই। আজ তাহার নিজেরই বিস্ময় লাগে, এ দুরন্ত তৃষ্ণা এতদিন তাহার মনের অতলে শান্ত হইয়া ছিল কি করিয়া? কিন্তু ছিল তো!

সুনিশ্চিত মৃত্যুর পূর্ব্বাহ্নে বিমলও ইহার বেশী আর কিছু চাহে নাই। কিন্তু সেদিনে সে স্পর্শে তাহার দেহ মার্ব্বেলের মতো ঠাণ্ডা ও কঠিন হইয়া উঠিয়াছিল,—কোথাও কোনো অনুভূতি ছিল না। এবং—এবং বিমলের প্রতি

একটু ঘৃণার উদ্রেকও হইয়াছিল বুঝি। তারপরে—কিন্তু তারপরে একটা যুগ বহিয়া গেছে।

বিদ্যুৎ সমীরণের চিবুক ধরিয়া মুখখানি তুলিয়া ব্যঙ্গ করিয়া বলিল,—তুমি কাঁদছো ?

বিদ্যুতের চোখের তারা চাপা হাসিতে কাঁপিতেছিল। সেদিকে চাহিয়া সমীরণ হাসিয়া ফেলিল। বলিল,—গাঁজার ভেগুর বলে তুমি আমায় উপেক্ষা কোরো না। মানুষের বুকের কথা মাঝে-মাঝে ভাবতে আমিও চেষ্টা করি।

চোখে-মুখে বিস্ময়ের ভাব দেখাইয়া বিদ্যুৎ বলিল,—আশ্চর্য্য তো ! তারপরে ?

—তারপরে আবার সব গুলিয়ে যায়। কাপড়ের গাঁটে আর গাঁজার জটায় সব তাল পাকিয়ে যায়।

—বিপদ তো কম নয়। তুমি চিকিৎসা করাও।

গভীর আবেগে বিদ্যুৎকে আকর্ষণ করিয়া জোর করিয়া পাশে বসাইয়া তার একখানি হাত ধরিয়া সমীরণ বলিল,—তাই করাবো। কাপড়ের দোকান আর গাঁজা বিক্রী সব একদিন পিছনে থাকবে পড়ে, আর আমার সকল রোগের ওষুধ আছে যার কাছে তারই হাতে নিশ্চিন্ত করে সমস্ত ভার সঁপে দোব। তারও দেরী নেই।

বিদ্যুৎ তার হাতখানি সরাইয়া লইয়া বলিল,—সে কি গো! "পুলিন যাবে ফরাক্কাবাদ চলে" ?

—হ্যাঁ, ফরাক্কাবাদ চলে, কিন্তু বাসা বাঁধবার জন্যে নয়—বলিয়া একখানি গান গাহিয়া মনের সঙ্কল্প জানাইবার জন্য কেবল সে খখানি ছুঁচল করিয়াছে এমন সময় বিদ্যুৎ তীব্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিল,—

—তা তুমি পারো। তুমি অত্যন্ত নিষ্ঠুর, অত্যন্ত নির্ম্মম, তুমি সব পারো।

বাসা ভাঙ্গিবার প্রস্তাব বিদ্যুৎ মোটে সহিতে পারে না। আপনার নিভৃত নীড়টির উপর তার গভীর মমতা বসিয়া গেছে। কিন্তু তাহার উষ্মার কারণ কি তাহা সমীরণ বুঝিয়া উঠিবার পূর্ব্বেই বিদ্যুৎ বলিল,—মেয়েদের 'পরে তোমার যে শ্রদ্ধা নেই, এ তো সবাই জানে। আমার রূপের আকর্ষণেই তুমি পিছু নিয়েছিলে, সে মোহ এখন ভেঙ্গেছে, এবার শিকল কেটে পালাবার জন্যে অস্থির হ'য়ে উঠেছ।

এত বড় কঠোর মন্তব্যে সমীরণ ব্যথিত হইয়া বলিল,—তোমার রূপ অনন্ত, কিন্তু শুধু তারই আকর্ষণে আমি তোমার পিছু নিয়েছি এ মিথ্যা তুমি কেমন কোরে বললে ?

কিন্তু তার কাতরতায় বিদ্যুৎ এতটুকু টলিল না। বলিল,—আমি বলিনি, বলেছ তুমি নিজে। তুমি নিজে

স্বীকার করেছ, নারীর যে-রূপ তা পুরুষকে লুব্ধ করে, মুগ্ধ করে, নারীর পিছু-পিছু টেনে নিয়ে বেড়ায়। তুমিই বলেছ, নারীর প্রতি পুরুষের যে শ্রদ্ধা তা এই।

কটুকণ্ঠে সমীরণ বলিল,—তা এই বটে, কিন্তু তোমার প্রতি আমার যে প্রীতি তা এই নয়। বলেছি, নারীর শক্তির 'পরে আমার শ্রদ্ধা নেই। তার মানে এ নয় যে, তোমার স্নেহের 'পরেও আমার শ্রদ্ধা নেই।

সমীরণকে এমন কটুকণ্ঠে কথা কহিতে বিদ্যুৎ কখনো শোনে নাই। সে অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সমীরণ বলিল,—'পিছু নেওয়া', 'শিকল কাটা' এ সব কথা তুমি কোথায় শিখেছ জানি না। কিন্তু মিথ্যে আঘাত দিয়ে আমার চোখে জল এনো না। পিছু আমি নিই নি, শিকল কাটার কোনো ইচ্ছাও জানাই নি। দোষ আমার এই যে, আমি এ বাসা ভাঙতে চেয়েছি। কিন্তু, বিশ্বাস করো, মক্ষিরাণীর যে বাসার 'পরে এত মমতা জন্মেছে, এ আমি আজ প্রথম জানলাম। কবিতা করার ইচ্ছা নেই, কিন্তু সত্যি বলছি, আজকে আমার বলে কিছু রাখিনি,— তোমার প্রেমে সমস্ত সমর্পণ করেছি।

সমীরণের চোখ দিয়া ঝরঝর করিয়া কয়েক ফোঁটা অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। অপরাধীর মতো কাছে আসিয়া বিদ্যুৎ

তার একখানি হাত নিজের করতলে গ্রহণ করিল। কিন্তু তাহাকে একটি সান্ত্বনার কথা বলিবার কিম্বা ত্রুটি স্বীকার করিবার কোনো অবসর না দিয়াই হাত ছাড়াইয়া লইয়া সমীরণ নিঃশব্দে জল-ভরা মেঘের মতো মন্থর গতিতে বাহির হইয়া গেল।

ভাবপ্রবণ দুটি তরুণ-তরুণী কখনো ভাব করিয়া কখনো ঝগড়া করিয়া এমনি ভাবে সংসার করে। ভাদ্রের মেঘের মতো কখনও আচম্বিতে হাসিতে-হাসিতে এক পশলা বৃষ্টি হইয়া যায়, কখনও কাঁদিতে-কাঁদিতে এক ঝলক রৌদ্রা-লোক খেলিয়া যায়। সর্ব্বক্ষণ মেঘ জমিয়া থাকে ক্বচিৎ।

দিনান্তে সত্যবতীর সঙ্গে অন্তত একবার দেখা করা চাই-ই। বয়সে কিছু ছোট হইলেও সত্যবতীর অভিজ্ঞতা বেশী। দিনান্তে অন্তত একবার কাছে ডাকিয়া তাহার সঙ্গে চুপি-চুপি গত রাত্রের গল্প না করিলে বিদ্যুৎ হাঁফাইয়া ওঠে। এমন কি, বিশেষ-বিশেষ ক্ষেত্রে সত্যবতীর পরামর্শ লওয়ারও প্রয়োজন হয়।

সত্যবতী লেখা পড়া জানে না, বয়সও কাঁচা। কিন্তু

তাহার তূণে একেবারে মোক্ষম-মোক্ষম অস্ত্র সংগৃহীত আছে। সুতরাং উপদেশও দেয় বাছা-বাছা। সমীরণ কাঁদিতে-কাঁদিতে উঠিয়া গেছে শুনিয়া সে একেবারে পুলকিত হইয়া উঠিল।

বলিল,—দিদি, পুরুষ-মানুষকে দিন রাত্রি চোখের জলে ভিজিয়ে রাখতে হয়, তবে সে নরম থাকে। রাশ ঢিলে দিয়েছ কি মাথায় উঠেছে। এই দস্তুর।

দস্তুর তো বটে, কিন্তু বিদ্যুৎ অতখানি পারে না। সমীরণের চোখে জল দেখিলে সে অস্থির হইয়া ওঠে।

তাহার মনের ভাব বুঝিয়া সত্যবতী হাসিয়া বলিল,—দিদি, ওঁর পায়ে কাঁটা ফুটলে দাঁত দিয়ে তুলে দিতে পারি, ওঁর এতটুকু মঙ্গলের জন্যে বুকের রক্ত দিতে পারি। সে স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু সংসার কোরতে গেলে, ওদের নাকে দড়ি পরাতেই হবে। নইলে ওরা সমস্ত উল্‌টে দেবে। স্বামীর চোখে জল দেখলে কষ্ট হয় বই কি! কিন্তু কি আর করা যাবে? ওই যে ওদের ওষুধ।

বিদ্যুৎ দেখিল, কথাটা মিথ্যা নয়। সমীরণ যেন আইন-কানুন, শান্তি-শৃঙ্খলা সমস্ত দু'পায়ে মাড়াইয়া শুধু তাহাকে বুকে করিয়া গ্রহে-গ্রহে ছুটিতে চাহে। এত উদ্দামতা সে সহিতে পারে না। সে চায় অশথ গাছের একটুখানি ছায়া, দুটি চোখের একটুখানি মায়া, একটি ছোট নীড়।

বিদ্যুতের ভাবী শিশুর জন্য কাঁথা সেলাই করিতে-করিতে সত্যবতী বলিল,—পুরুষ-মানুষ কেমন জানো? সেই যে কথায় বলে "খায়, আর বন পানে-পানে চায়"—তেমনি। ছুটে পালাবার জন্যে ব্যাকুল হ'য়েই আছে।

কাঁথা সেলাই দেখিতে-দেখিতে একটুখানি মুচ্‌কি হাসিয়া বিদ্যুৎ বলিল,—কি নাম রেখেছে, জানো?

সেলাই হইতে মুখ না তুলিয়াই সত্যবতী বলিল,—না।

বিদ্যুৎ বলিল—অশোক। মানে কি জানো? যার কোনো শোক নেই। মানুষের ছেলের নাম অশোক! বিদ্যুৎ হাসিতে লাগিল।

সত্যবতী দুষ্টুমির হাসি হাসিয়া বলিল,—আর যদি মেয়ে হয়

বিদ্যুৎ জোর করিয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল,—না, না মেয়ে কেন হবে? ছেলেই হবে।

আমোদ হইয়াছে বেশী দিবাকর-প্রভাকরের। সত্যবতী বলিয়া দিয়াছে, শীঘ্রই তাহাদের ভাই আসিবে। কাঁথা সেলাই হইতে আরম্ভ করিয়া যত কিছু উদ্যোগ-আয়োজন চলিতেছে, সব সেই অনাগত ভাইটির জন্য। তাহার আগমনের প্রতীক্ষায় উহারা দুইজন অধীর হইয়া উঠিয়াছে। রোজ সকালে উঠিয়া একবার করিয়া জিজ্ঞাসা করে,—মা, ভাইটি এসেছে?

সত্যবতী হাসিয়া বলে,—আজকে কি রে! সে এখনো দু'মাস পরে।

দু'মাস কতদিন বেচারীরা জানে না। দু'দিন-পাঁচদিন পরে আবার জিজ্ঞাসা করে। সত্যবতী বলে,—সে কি রে! দু'মাস কি এখনো হ'য়েছে নাকি?

বার-বার মনঃক্ষুণ্ণ হওয়ায় ছেলে দুটি চটিয়া গেছে। এখন তাহারা রাগিয়া মুখ ভার করিয়া বলে,—ভাইটি আসবে, না হাতী আসবে।

ছেলে দুটি যেন কি! বিদ্যুৎ এবং সত্যবতী ইহাদের কথায় হাসিয়া আকুল হয়।

বিদ্যুতের একটু ভয়ও হইয়াছে। এদেশে প্রসূতির মৃত্যুহার যে কত বেশী তাহা তাহার অজানা নয়। জীবনের পরে কেমন যেন মায়া বসিয়াছে। তাছাড়া সমীরণ আছে,—যে নিজে কোনো কাজ করিতে পারে না; বিদ্যুৎকে সমস্ত জিনিষ তার হাতের কাছে আগাইয়া দিতে হয়।

কিন্তু এ ভয় সে প্রকাশ করে না। শুধু যে কয়টা দিন বাঁচিয়া আছে সে কয়টা দিন নিবিড় করিয়া সমীরণকে জড়াইয়া থাকিবার চেষ্টা করে। তথাপি, সে ভয় সম্পূর্ণ ভাবে গোপন করিতেও পারে না। মাঝে-মাঝে এক-একটা প্রশ্নে তাহার মনের ভয় ও উৎকণ্ঠা প্রকাশ হইয়া পড়ে।

—আচ্ছা, আমি মরে গেলে তুমি খুব কাঁদবে, না ?

সমীরণ হাসিয়া বলে,—না, আমি পরমানন্দে রসগোল্লা খাব।

তাহার মৃত্যুতে যে সমীরণ কত ব্যথা পাইবে তাহা বিদ্যুৎ জানে। এ উত্তরে তাই সে মনে-মনে খুসীই হয়। তবু প্রেম বারে-বারে যাচাই করিবার মেয়েদের যে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি আছে, বোধ হয় তাহারই বশে মুখ ভার করিয়া বলে,—তা তুমি পারো। দু'দিন যেতে না যেতেই আবার একটা বিয়ে কোরে সংসার পাতবে।

বিদ্যুতের এলোচুলের প্রান্ত মুঠায় করিয়া চিপিতে-চিপিতে সমীরণ বলিল,—নিশ্চয়। ওটা আমার একটা ব্যবসা কি না! আমার তিনটে ব্যবসা,—কাপড়ের, গাঁজার আর বিয়ে করার।

এবারে বিদ্যুৎ জোরেই হাসিয়া ফেলিল। বলিল,—নয় তো, বনে-বনে আমলকী গাছের ছায়ায়-ছায়ায় দিব্যি ঘুরে বেড়াবে। সে একটা স্বপ্ন তো তোমার আছেই।

—তা আছে। কিন্তু সে স্বপ্নের রন্ধ্রে-রন্ধ্রে যে মায়ার স্পর্শ দেবে সে তো তুমি। দেখ, স্বয়ং কবিগুরু রামচন্দ্রকে প্রাণ ধরে একলা, এমন কি শুধু লক্ষ্মণের সঙ্গেও বনে পাঠাতে পারেন নি। আর তুমি একলা আমায় বনে পাঠাতে চাও? হায় রে কলিকাল!

বিদ্যুৎ খুসী হইয়া যায় এবং নিদ্রা না আসা পর্য্যন্ত একজাই পুরাতন বিস্মৃত এবং অর্দ্ধবিস্মৃত কাহিনী রোমন্থন করিয়া চলে। ঘুম বাড়িয়াছে, কিন্তু জাগিয়া থাকিবার ইচ্ছা আছে ষোলো আনা।

ছেলেই হইল,—সুকুমার, কান্তিমান, বলিষ্ঠ শিশু।

মক্ষির আর কাজের অন্ত নাই। দোল্‌নায় শুইয়া-শুইয়া অশোক আপন মনে খেলা করে, কাজ করিতে-করিতে বিদ্যুৎ দশবার ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে দেখিয়া যায়। চুমু খাইয়া, কোলে করিয়া, বুকে চাপিয়া ধরিয়া তাহার আর আশ মিটে না, সহস্রবার দেখিয়াও দেখা শেষ হয় না।

রাত্রে ঘুমাইয়া আছে, অকস্মাৎ চমকিয়া চাহিয়া দেখিল, কোলের কাছে ছেলে নাই। বিদ্যুৎ ভয়ার্ত্তকণ্ঠে সমীরণকে ঠেলা দিয়া জাগাইয়া বলিল,—ওগো, অশোক কই?

তাহার ভীতকণ্ঠে চমকিয়া সমীরণ তড়াক্ করিয়া বিছানার উপর উঠিয়া বসিয়া বলিল,—কি হয়েছে?

এমন সময় উভয়েরই দৃষ্টি পড়িল, অশোক পা-তলার

দিকে দিব্য আরামে শুইয়া হাত-পা ছুঁড়িয়া ব্যায়াম কৌশল আয়ত্ত করিতেছে। পা ছুঁড়িতে-ছুঁড়িতেই সে যে কখন পা-তলার দিকে সরিয়া গেছে বিদ্যুৎ কিছুই টের পায় নাই।

সে তাহাকে কোলে করিয়া বারম্বার চুমু খাইয়া বিশুদ্ধ বাঙলায় উপদেশ দিতে লাগিল,—অমন দুরন্তপণা করিতে নাই। সবাই তাহা হইলে মন্দ বলিবে। রাত্রিতে শান্ত হইয়া চুপ করিয়া এক জায়গায় শুইয়া থাকিতে হয়।

এ উপদেশ কতখানি এই ছয় মাসের শিশু হৃদয়ঙ্গম করিল তাহা সে-ই জানে। সে শুধু কোলের উপর শুইয়া আরও স্ফূর্ত্তিতে হাত-পা ছুঁড়িতে লাগিল এবং পিট্‌পিট্‌ করিয়া চাহিয়া হাসিতে-হাসিতে অস্ফুট শব্দ করিতে লাগিল।

বিদ্যুৎ বলিল,—ছেলেটা কি দুষ্টু হয়েছে দেখছ?

সমীরণ তখন শুইয়া পড়িয়া দ্বিতীয় পর্ব্ব নিদ্রার আয়োজন করিতেছিল। বলিল,—তোমারই ছেলে তো!

তাহাকে একটা চিম্‌টি কাটিয়া বিদ্যুৎ বলিল,—আর তোমার নয় বুঝি?

ও-পাশ ফিরিয়া শুইয়া সমীরণ বলিল,—কি জানি।

ছেলে কোলে করিতে সমীরণ মোটে পারে না। ইহার জন্য বিদ্যুতের কাছে তাহাকে নিত্য কম গঞ্জনা সহিতে হয় না। বিদ্যুতের মান ভাঙ্গাইবার জন্য তাহাকে বাধ্য হইয়া

মাঝে মাঝে অশোককে কোলে করিতে হয়। বিদ্যুৎকে সে কিছুতেই বুঝাইতে পারে না যে, কোলে করিতে না পারাটা অক্ষমতার জন্য, ছেলের 'পরে স্নেহ তাহার কম নয়।

বিদ্যুৎ রাগিয়া বলে,—আমিও তো এর আগে ছেলে কোলে করিনি। আমি কি কোরে পারছি?

সমীরণ বলে,—ও ক্ষমতা তোমাদের স্বভাবসিদ্ধ।

বিদ্যুৎ সে কথা কিছুতে মানে না। বলে,—আর অন্য পুরুষ-মানুষে ছেলে কোলে করছে না। দেখ গে, সত্যবতীর বরের—

কিন্তু ছেলেটা ভালো,—বাপের দুঃখ বোঝে। কোলে চড়িয়া বেড়াইতেই সে ভালোবাসে না। সমীরণ মিনিট দুই কোলে করিয়া চুপি-চুপি এক কোণে তাহাকে নামাইয়া দিয়া সরিয়া পড়ে। ছেলেটা বেশ খেলা করে,—কাঁদেও না, কিছু না।

বিপদ হইল, অশোক আরও একটু বড় হইয়া যখন রীতিমত হামা দিয়া টহল দিতে শিখিল এবং ভোজ্যাভোজ্য পৃথিবীর যাবতীয় বস্তুর আস্বাদ গ্রহণে ব্যগ্র হইল। তখন তাহাকে সামলাইয়া রাখা একা বিদ্যুতের পক্ষে অসাধ্য হইয়া উঠিল। ছেলে ধরিবার জন্য একটা লোক অবশ্য রাখা হইল। কিন্তু সে চব্বিশ ঘণ্টা থাকিতে পারে না, এবং

চব্বিশ ঘণ্টা তাহার কাছে রাখিয়াও বিদ্যুতের বিশ্বাস হয় না।

একদিন তো প্রলয় কাণ্ড আরম্ভ হইল।

দুপুর বেলা। বিদ্যুৎ একমনে বসিয়া অশোকের একটা জামা শেলাই করিতেছিল। এমন সময় চাকরটা আসিয়া তাহার কাছে অশোককে নামাইয়া দিয়া খাইবার জন্য বাড়ী চলিয়া গেল। কতক্ষণ আর? আধ ঘণ্টার বেশী হইবে না, বিদ্যুৎ চাহিয়া দেখে, অশোক নাই। ভাবিল, বোধ হয় বাহিরে খেলা করিতেছে। ডাক দিল, কোন সাড়া আসিল না।

তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া দেখিল, কোথাও অশোক নাই। সমস্ত ঘর, এমন কি রান্নাঘর পর্য্যন্ত খুঁজিয়া আসিল, কোথাও নাই। সর্ব্বনাশ! উঠানের এক কোণেই একটা ইঁদারা আছে। তাহার চারিদিকে উঁচু করিয়া যদিও ঘের দেওয়া আছে, কিন্তু বিপদ ঘটিতে কতক্ষণ! একবার ইঁদারার উপর ঝুঁকিয়া দেখিল, জল নড়িতেছে না। কিন্তু আধ ঘণ্টার উপর হইয়া গেছে। হয় তো এতক্ষণ ধরিয়া জল আলোড়িত হইয়া এই মাত্র শান্ত হইয়াছে। কিছু বিচিত্র নয়।

সমীরণ খাইয়া-দাইয়া গাঁজার দোকানে বাহির হইয়া

গেছে, শীঘ্র ফিরিবার সম্ভাবনা নাই। বিদ্যুৎ কাঁদিয়া কাটিয়া, চুল ছিঁড়িয়া তুমুল কাণ্ড আরম্ভ করিয়া দিল। খিড়কীর এবং সদরের দুইটা দরজাই ভিতর হইতে বন্ধ। বাহিরে অশোক কিছুতেই যাইতে পারে নাই। তবে?

এমন সময় বারান্দার এককোণে শিশুর কান্না শোনা গেল। বিদ্যুৎ চিলের মতো একেবারে সেখানে ছুটিয়া গেল।

অশোকচন্দ্রই বটে। ওই কোণটায় কতকগুলা বেতের ঝুড়ি সারি সারি উঁচু করিয়া সাজানো ছিল। অশোক কি করিয়া সেখানে প্রবেশ করিয়াছিল এবং অর্দ্ধঘণ্টার মধ্যে স্তূপের বাহিরে আসিতে না পারিয়া শেষ ব্রহ্মাস্ত্র ক্রন্দনের পন্থা অবলম্বন করিয়াছিল। বেচারা না পারে এদিকে আসিতে, না পারে ওদিকে যাইতে। বিদ্যুৎকে দেখিয়াই সে দু'হাত বাড়াইয়া দিল।

এমন সময় সদর দরজায় করাঘাত হইল এবং সমীরণের কণ্ঠ শোনা গেল,—দরজা খুলে দাও।

অশোককে ভর্ৎসনা করা আর হইল না, সে তাড়াতাড়ি তাহাকে কোলে করিয়াই ছুটিয়া আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল। ইচ্ছা, পুত্রের বদলে পিতাকে বেশ দু'কথা শোনাইয়া দেওয়া। কিন্তু দ্বার খুলিয়াই এক জটাজুটধারী সন্ন্যাসীকে সমীরণের

সঙ্গে দেখিয়া সে অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল। কিন্তু পরক্ষণেই তাঁহার শান্ত, প্রসন্ন হাস্যে চিনিতে পারিয়া একেবারে তাঁহার হাত ধরিয়া বলিল,—মেজ-দা! তুমি? সে প্রণাম করিতেও ভুলিয়া গেল।

মেজ-দা কিন্তু বিদ্যুতের কোলে ছেলে এবং তাহার চেহারার অপরূপ পরিবর্ত্তন দেখিয়া বিস্মিতভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তার ঋজু দীর্ঘ দেহ ঈষৎ নুইয়া পড়িয়াছে, চোখের সে তীব্র জ্যোতি নাই, মুখে-চোখে একটা শান্ত, সুস্থির ভাব। সে-দৃষ্টির পানে চাহিয়াই বিদ্যুৎ বুঝিল, মেজ-দার বিস্ময় কোথায়। অসীম লজ্জায় সে নতনেত্রে সঙ্কুচিত অপরাধীর মতো দাঁড়াইয়া রহিল। আর সমীরণ পাশ কাটাইয়া একেবারে ঘরের ভিতরে সরিয়া পড়িল।

গাঁজার দোকান হইতে ফিরিবার পথে সমীরণের সঙ্গে মেজ-দার দেখা। প্রথমটা সমীরণ তত খেয়াল করে নাই, পাশ কাটাইয়া চলিয়া আসিতেছিল। মেজ-দা কিন্তু তাহাকে চিনিতে পারিয়া সুমুখে আসিয়া পথ আগলাইয়া দাঁড়াইয়া হাসিতে লাগিলেন। তখন সমীরণ তাঁহাকে চিনিতে পারিল, এবং পায়ের ধূলা লইয়া বাসায় নিয়া আসিল। বিদ্যুৎ যে এখানে আছে, সে কথা সে বলিয়াছে। কিন্তু তার বেশী আর কিছু লজ্জায় বলিতে পারে নাই।

বন্ধনী

কতক্ষণ পরে মেজ-দা গভীর বেদনায় একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন,—চলো, ঘরে যাই।

দীর্ঘশ্বাস ফেলিবারই কথা। অপরিসীম স্নেহে যে-মেয়েটিকে একটু-একটু করিয়া নিজের হাতে তিনি মানুষ করিয়া গিয়াছিলেন, তীর্থপর্য্যটন হইতে প্রত্যাগমন করিয়া তাহাকে আর ফিরিয়া পাইবেন না, ইহা কি তিনি স্বপ্নেও ভাবিয়াছিলেন? যে-মেয়েটি পার্ব্বত্য ঝরণার মতো কুটিল তরঙ্গভঙ্গে নাচিতে-নাচিতে বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িত, মেজ-দা বুঝিলেন, সে গেছে নিঃশেষ হইয়া। এইখানে তিনি ভুল করিলেন। সে নিঃশেষ হয় নাই, বরং ভাদ্রের নদীর মতো কূলে কূলে ছাপাইয়া উঠিয়া নিঃশব্দে বহিয়া চলিয়াছে। লঘু গতি গুরু হইয়াছে।

বিদ্যুৎ মেজ-দাকে তাহাদের শয়ন-কক্ষে লইয়া আসিতে পারিল না। আগে যে ঘর-খানিতে সে শুইত, সেইখানে তাঁহার জন্য আসন পাতিয়া দিল। আস্তে আস্তে বলিল,—তোমার হাত মুখ ধোবার জল আনি?

মেজ-দা মেঘের মতো গম্ভীর মুখে বলিলেন,—আনো।

অতবড় জটা এবং অতবড় দাড়ি অশোক ইতিপূর্ব্বে কখনো দেখে নাই। ভয়ে ভালো করিয়া সে ও-দিকে চাহিতেও পারিতেছিল না, আবার কৌতূহলও দমন করা

অসাধ্য। বিদ্যুৎ তাহাকে লইয়া বাহির হইয়া আসিতে সে যেন বাঁচিয়া গেল।

শোবার ঘরে আসিয়া বিদ্যুৎ তাহাকে সমীরণের কাছে নামাইয়া দিয়া নবোঢ়া বালিকার মতো চুপে-চুপে বলিল,—তুমি মেজ-দার কাছে বোসো গে। আমি হাত-মুখ ধোবার জল দিয়ে একটু খাবারও তৈরি করবো কি না।

সমীরণ পা ঝুলাইয়া খাটের উপর বসিয়াছিল, এই প্রস্তাবে একেবারে চিৎ হইয়া শুইয়া পড়িয়া শুধু বলিল,—ওরে বাবা!

নিজের দুর্ব্বলতায় বিদ্যুৎ নিজের উপরই বিরক্ত হইতেছিল। তারই ঝাঁজ সে সমীরণের উপর ফেলিল, বলিল,—ওরে বাবা কেন? মেজ-দা কি বাঘ না ভালুক?

সমীরণ কিন্তু তথাপি আশ্বাস পাইল না। ও-পাশ ফিরিয়া শুইল।

এমন সময় ও-ঘর হইতে মেজ-দার কণ্ঠ শোনা গেল,—মণি কোথায় গেল?

সঙ্গে-সঙ্গে বিদ্যুৎ দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল এবং সমীরণ তড়াক্ করিয়া লাফাইয়া উঠিয়া বলিল,—আজ্ঞে এই যে, যাই।

বহুদিন পরে সেই পুরাতন ডাকে মেজ-দা আবার

তাহাকে ডাকিলেন। সমীরণ খোকা কোলে করিয়াই ও-ঘরে চলিয়া গেল। বিদ্যুৎ জল আনিয়া বারান্দায় রাখিল। মেজ-দা হস্তপদ প্রক্ষালন করিয়া সমীরণের সঙ্গে গল্প করিতে বসিলেন।

অনেকক্ষণ পরে বিদ্যুৎ যখন চা ও খাবার লইয়া আসিল, তখন অশোকচন্দ্র তাহার জটাধারী মামার কোল জাঁকাইয়া বসিয়াছে এবং সভয়ে মাঝে-মাঝে দাড়িতে ও জটায় একবার করিয়া আঙ্গুল ঠেকাইয়াই সরাইয়া লইতেছে। ওই ঘন জঙ্গলে ভীতিপ্রদ কত কি যে থাকিতে পারে বলা তো যায় না।

মেজ-দা বলিতেছিলেন,—এ আমি জানতাম। রক্ত-বিপ্লব কোনো দিন এদেশে সফল হ'তে পারে না, কোনো দিন না। তবু যখন তোমাদের ছেড়ে চলে আসি, তখনও নিঃসংশয় হ'তে পারি নি। তাই তোমাদের বাধা দিই নি। যদি বুঝতাম, স্বাধীনতা একটা পদার্থ, যা ওরা আমাদের ঘর থেকে চুরি কোরে নিয়ে ওদের রাইটার্স বিল্‌ডিংসের টেবিলের দেরাজে লুকিয়ে রেখেছে, তাহোলে বলতাম, চল সমীরণ, একদিন রাত্রে সেটা চুরি কোরে নিয়ে এসে স্বস্থানে রেখে দিই গে। তুমি বলতে পারো, ওদের কোন্ বাড়ীতে আমাদের স্বাধীনতা লুকোনো আছে, কোন্ লোকটির

কাছে ? সমীরণ, স্বাধীনতা অন্তরের ধন, আমরা নিজের দোষে তা খুইয়েছি। পরের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে সান্ত্বনা হয়তো মিলবে, কিন্তু তাতে কোনো লাভ নেই।

মেজ-দা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন,—সমস্ত ভারতবর্ষ তো ঘুরে এলাম। সবাই গান্ধীরাজের জন্যেই ব্যস্ত, স্বরাজের 'পরে কারো কোনো বিশেষ লোভ আছে বলে তো মনে হোল না। স্বরাজের কামনা হয়তো মনের অতলে লুকিয়ে কোথাও আছে, আজও দলগুলি মেলতে পারে নি। যাবে সমীরণ, এই কোটি-কোটি স্বদেশবাসীকে মানুষ কোরতে আবার একবার বেরুবে ?

কিন্তু সমীরণ জবাব দিবার পূর্ব্বেই বিদ্যুৎ বলিল,—আমরা আর বেরুবো না, মেজ-দা। যে-কথার মানে জানিনে, সে-কাজে আমরা আর নামতে পারবো না।

—কি কথার মানে জানো না ?

—ওই মানুষ করার কথার, মেজ-দা। কাকে মানুষ বলে, আর কাকে বলে না, সে আমরা আজও বুঝিনি।

মেজ-দা ব্যথিত নেত্রে বিদ্যুতের পানে চাহিলেন।

বিদ্যুৎ বলিল,—এর জন্যে তোমাকে নতুন একটা সন্তান-দল গড়তে হবে। আমরা এইখানেই রইলাম। তোমার সন্তানদল আমাদের মানুষ করতে যদি কোনোদিন আমাদের

কুটিরে পদার্পণ করেন আমরা বরং পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়ে তাঁদের সম্বর্দ্ধনা করবো। তোমার মুক্তি খুব বড় জিনিস মেজ-দা, স্বদেশের মুক্তি আরও বড় জিনিস। এর জন্যে ভারতের কোটি-কোটি সন্তানকে মানুষ করতে হবে সেও বুঝি। কিন্তু আমার এই একটি মাত্র সন্তান, মেজ-দা। যদি একে কোনোমতে মানুষ করতে পারি, তাহোলেই বুঝবো, আমার যা করবার তা করা হোল।

বলিবার কথা মেজ-দার যথেষ্ট ছিল। কিন্তু এতক্ষণে বিদ্যুতের অন্তর বুঝিবার তাঁহার আর বাকী ছিল না। বুঝিলেন এখানে বৃথা চেষ্টা। তিনি কোনো কথা না বলিয়া আহারে মনোনিবেশ করিলেন।

বস্তুত বিদ্যুতের আশ্রয়ে মেজ-দা আরও চারিদিন রহিয়া গেলেন, কিন্তু দেশের অবস্থা ও সে অবস্থায় কি করা কর্ত্তব্য, সে সম্বন্ধে বিদ্যুতের সঙ্গে আর একবারও আলাপ করিলেন না। কেবল মাঝে-মাঝে একটু-আধটু আঘাত দিতেন। যথা :—

—একটা গল্প শুন্‌বি, মক্ষি?

—কি গল্প ?

—একটি মেয়ে ছিল, তলোয়ারের মতো ঝক্‌ঝকে—বিদ্যুতের মতো জ্বালাময়ী। সে ছিল আমার বোন। একদিন—

—জানি, জানি। সে অভাগী মরে গেল তো ?

—না, মরেনি। একদিন—

—হ্যাঁ, সে মরেছে মেজ-দা। আমি নিজে দেখেছি।

—কিন্তু আমি দেখেছি, সে বেঁচেই আছে। একেবারে মরচে ধরে গেছে।

—তুমি যাকে দেখেছ সে অন্য লোক মেজ-দা। সে অশোকের মা। আমি জানি, তোমার সে বোন মরে গেছে।

—তা হবে!—মেজ-দা দীর্ঘশ্বাস ফেলিলেন।

পরের দিন মেজ-দা চলিয়া গেলেন। এবং বিদ্যুৎ যদি ভুল দেখিয়া না থাকে, যাওয়ার সময় অশোককে বিদ্যুতের কোলে দিয়া তিনি যখন শিশুটির সুকোমল গালে চুমু দিলেন, তখন তাঁহারও দুই চোখ জলে ভরিয়া উঠিল।

বিদ্যুৎ তো ক্রমাগত ঘষিয়া চোখ দু'টা জবা ফুলের মতো লাল করিয়া ফেলিল। বলিল,—আমারই কপাল থেকে তুমি এসেছিলে মেজ-দা, তবু তোমায় ছেড়ে দিতে বুক ফেটে যাচ্ছে। যাদের কোনোদিন চোখেও দেখনি, সেই অগণিত

ভাই-বোনের জন্যে তোমার ব্যথার অন্ত নেই, কিন্তু আমার দুঃখ কি দেখতে পাও না ?

মেজ-দা হাসিয়া বলিলেন,—তাদের দেখিনি কে বললে রে ?

বিদ্যুৎ মাথায় একটা ঝাঁকি দিয়া বলিল,—কিছুতে দেখনি মেজ-দা। আমার মতো কোরে তুমি পৃথিবীর আর কোনো মেয়েকে দেখনি।

মেজ-দা চলিয়া গেলে বিদ্যুৎ খাটের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া একেবারে ছেলেমানুষের মতো কাঁদিতে লাগিল। সমীরণ আসিয়া তাহাকে কত করিয়া সান্ত্বনা দিয়া বুঝাইতে সে আস্তে-আস্তে ও-ঘরে গেল।

সমীরণ বলে,—অদ্ভুত মানুষ এই মেজ-দা! না বিদ্যুৎ ? এই পৃথিবীর ভিতরে, এই পৃথিবীর বাইরে কোথাও তাঁর কোনো বন্ধন নেই। এ কি সহজ ?

বিদ্যুৎ বলে,—সহজ নয় কেন ? ওঁর পক্ষে ওইটেই সহজ, আর ওর উল্‌টোটাই কঠিন।

—ও কথা বোলো না, বিদ্যুৎ। মেজদা নির্ম্মম তো নন। অশোককে নামিয়ে দেবার সময় তাঁর চোখে জল দেখ নি ?

—সেইটেই বুঝতে পারি নি। সকলকে নিঃশব্দে সরিয়ে

দিয়ে উনি যখন চ'লে যান, তার মানে বুঝি। কিন্তু ওঁর চোখে জল আমাকে বিস্মিত করেছে।

—ওতে বিস্ময়ের কিছু নেই। ব্যথা ওঁরও বাজে। কিন্তু ওদিকের টান এদিকের ব্যথাকেও ছাপিয়ে ওঠে বলেই ছেড়ে যাওয়া সম্ভব হয়।

বিদ্যুৎ একটু থামিয়া বলে,—প্রিয়জনকে ছেড়ে যাওয়া কি খুব বাহাদুরীর কাজ নাকি?

—কোন্‌টা বাহাদুরীর কাজ সে আমিও জানিনে, বিদ্যুৎ। শুধু বুঝি, সত্যিকার মানুষদের এমনি কোরে প্রিয়জনদের ছেড়ে যাওয়ার প্রয়োজন হয়। সে প্রয়োজন হয়েছিল বুদ্ধের, হয়েছিল চৈতন্যের।

—আশ্চর্য্য নৃশংসতা! প্রিয়ার দুঃখ যে বুঝলে না, মানুষের দুঃখে তার বেদনার সিন্ধু উদ্বেল হ'য়ে উঠলো! আচ্ছা, তুমি বলতে পারো, স্ত্রীর সঙ্গে কি ধর্ম্মাচরণ হয় না?

সমীরণ হাসিয়া বলিল,—না, সে আমি বলতে পারবো না। তবে আমার মনে হয়, তা হয় না বলেই তাঁরা নিয়ে যান নি।

—তোমার মনে হয়? কেন মনে হয়?

—এইজন্যে যে, তোমরা নিজেরাও অত দূর দৌড়ুতে

পারো না, সঙ্গীটিকেও অতদূর দৌড়ুতে দেবে না। কেন মনে হয় জানো, বিদ্যুৎ? তোমায় তো দেখলাম, এত বড় প্রতিভাশালিনী মেয়ে লক্ষেও একটার বেশী হয় না। সেই তোমারও দৌড়ের একটা সীমা আছে। ওর বেশী টান তোমার স্নায়ুতে সয় না। অথচ, তোমার অর্দ্ধেক প্রতিভা নিয়ে একটা ছেলে ওর দ্বিগুণ যেতে পারে।

বিদ্যুৎ গুম্ হইয়া কিছুক্ষণ বসিয়া রহিল। তারপর আস্তে-আস্তে বাহিরে চলিয়া গেল। একটু পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল,—দেখ, তোমায় আমি মুক্তি দিলাম। তুমি যা খুসী করতে পারো, যেখানে খুসী যেতে পারো। আমি এতটুকু বাধা দোব না। মিছে তোমায় আট্‌কে রাখা।

কথাটা সে পরিহাস করিয়া বলে নাই। এবং এইটুকু বলিতেই অশ্রুর বাষ্প তাহার কণ্ঠরোধ করিল। সে উদ্গত অশ্রু চাপিতে-চাপিতে চলিয়া গেল।

আট্‌কাইয়া রাখিয়া কোনো লাভও নাই। মেজ-দা তাহাকে আবার একটা নূতন মন্ত্রে দীক্ষা দিয়া গেছেন। এবার আর বোমা, রিভলভার লইয়া নয়। এবারে দিয়া গেছেন ভারতের এই তেত্রিশ কোটি মানুষকে সেবা করিবার মন্ত্র। তাহারই নেশায় সে কিছুদিন হইতে বিভোর হইয়া আছে।

বিদ্যুৎ চলিয়া যাওয়ার পর সে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তারপর আলমারী খুলিয়া একখানি কবিতার বই বাহির করিয়া মেস্‌ফিল্‌ডের "সী-ফিভার" কবিতাটি পড়িতে বসিল। এই কবিতাটি তার বড় ভালো লাগে, কিছু না হইলেও অন্তত একশত বার পড়িয়াছে। যখনই পড়ে, মনে হয়, সমুদ্র তাহাকে আহ্বান করিতেছে,—তাহাকেও যাইতে হইবে। নির্জ্জন সমুদ্র এবং আকাশ তাহাকেও ডাক দিতেছে। নৌকা মিলিয়াছে, মাথার উপর ধ্রুবতারা তাহার দিঙ্‌নির্ণয়ের জন্য জাগিয়া আছে। এই ধূসর কুয়াসাচ্ছন্ন সমুদ্রে সাদা পাল তুলিয়া তাহাকেও উষাযাত্রা করিতে হইবে। এই অমোঘ, সুতীব্র আহ্বানে 'না' বলিবার সাধ্য কি! যাযাবর জীবনের মোহ তাহাকে অভিভূত করিয়াছে। ঝড়ের বাঁশী, ধারালো ছুরির মতো তীক্ষ্ণ বাতাসের ঝাপ্‌টা তাহাকে উতলা করিয়া তুলিয়াছে।

> And all I ask is a merry yarn from a
> laughing fellow-rover,
> And a quiet sleep and a sweet dream when
> the long trick's over.

সমীরণ দীর্ঘশ্বাস ফেলিল। হায়, হাস্যময়ী সহযাত্রী

তাহার কই? নিশ্চিন্ত নিদ্রা এবং সুমধুর স্বপ্ন আজ কতদূরে!

কিন্তু খানিক পরে বিদ্যুৎ যখন খাবার আনিয়া তার সম্মুখে রাখিল, তখন তার মুখে আষাঢ়ের মেঘের ছবি দেখিয়া তার স্বপ্নজাল একেবারে ছিঁড়িয়া গেল। বিদ্যুৎ কিন্তু একটা কথাও কহিল না। যেমন গুম্ হইয়া আসিয়াছিল, তেমনি করিয়াই চলিয়া গেল।

সমস্ত দিন এইভাবেই চলিল। একজন অপ্রসন্ন মুখে এড়াইয়া চলিবার চেষ্টা করে, আর একজন তাহাকেই খুশী করিবার জন্য পিছু পিছু ঘোরে।

রাত্রে অশোককে লইয়া বিদ্যুৎ তাহার নিজের বিছানায় গম্ভীরভাবে শুইয়া পড়িল। সমীরণও ও-খাটে শুইয়া-শুইয়া স্বপ্ন রচনা করিতে লাগিল,—

I must go down to the seas again,
to the vagrant gipsy life,
To the gull's way and the whale's way where
the wind's like a whetted knife.

অনেকক্ষণ পরে বিদ্যুৎ সমীরণের খাটের কাছে দাঁড়াইয়া গম্ভীর ভাবে প্রশ্ন করিল,—বিকেলে তোমার শরীরটা খারাপ করছিলো বলছিলে যে, এখন কেমন আছ?

—ভালো।

তার পা-তলার দিকে বসিয়া বিদ্যুৎ বলিল,—দেখি, তোমার পায়ে একটু হাত বুলিয়ে দিই।

সমীরণ তাড়াতাড়ি পা সরাইয়া লইয়া বলিল,—না, না, থাক্। আমি এখন বেশ আছি। কিচ্ছু কষ্ট হচ্ছে না।

অত্যন্ত ক্লান্ত স্বরে বিদ্যুৎ বলিল,—আমাকে আর জ্বালিও না। দেখি—

সমীরণ আর একটি কথাও বলিতে সাহস করিল না। বিদ্যুৎ তাহার একখানি পা কোলের উপর লইয়া হাত বুলাইতে লাগিল।

সমীরণ হাসিয়া বলিল,—সমস্ত দিন এই সংসার নিয়ে তো হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম। তার উপর রাত্রিতে আবার এই। এতও পারো!

বিদ্যুৎ একটু হাসিয়া বলিল,—কিন্তু আমরা তো দেশোদ্ধার করতে পারি নে।

সে কথার কোনো উত্তর না দিয়া সমীরণ বলিল,—এই একটু আগে আমাকে যদি সমস্ত দায় থেকে মুক্তি দিয়েই গেলে, তবে আবার কেন এমন কোরে বাঁধতে এলে?

সমীরণ তার হাতদুটি ধরিয়া ঈষৎ আকর্ষণ করিতেই বিদ্যুৎ তার বুকের কাছটিতে আসিয়া বসিয়া বলিল,—তুমি

বুঝি সেই আনন্দে আছ? সে হচ্ছে না। তোমার মুক্তি কোনো কালেই নেই।

একটু থামিয়া বলিল,—না, সত্যি, আজকে আমার মনটা এমন খারাপ হ'য়ে আছে যে, কিছু ভালো লাগছে না। মেজ-দা যে আমার মাথা কতখানি খেয়ে গেলেন বুঝতে তো পারছি নে, কিন্তু এমন ভয় করছে আমার, তা আর কি বলবো।

সমীরণ তার দুটি করতল মুঠার মধ্যে লইয়া বলিল,—ভয় কিসের?

বিদ্যুৎ অকস্মাৎ তার বুকের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া বলিল,—তুমি বলো, তুমি কোনোদিন আমাকে ছেড়ে যাবে না। আমাকে এমনি অসহায় অবস্থায় ফেলে যেতে তোমার কষ্ট হবে না? তুমি কি ভেবেছ তুমি চলে গেলে আর একটা দিনও আমি বাঁচবো? তখন তোমার অশোকের কি দশা হবে তা ভেবেছ? আমার গায়ে হাত দিয়ে বলো, তুমি কোথাও যাবে না।

বিদ্যুতের চোখের জল সমীরণ সহিতে পারে না। তার চোখের কোণ বহিয়া বড়-বড় দু'বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। সে বিদ্যুতের মাথায় হাত বুলাইতে-বুলাইতে বলিল,—তোমার গায়ে হাত দিয়ে বলছি, আমি কোথাও যাবো না। তোমাকে

মিথ্যে বলবো না, আজই আমার কলকাতা যাবার কথা ছিল। ষ্টেশনে আমার জন্যে লোক অপেক্ষা কোরে থাকবে। কিন্তু তোমার চোখে জল ফেলে কোথাও যাবো না, এ আমি তোমার গায়ে হাত দিয়ে বলছি।

বিদ্যুৎ বিস্মিতভাবে উঠিয়া বসিয়া বলিল,—ভিতরে-ভিতরে এতদূর স্থির হ'য়ে গেছে! অথচ—সে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিল।

অনেকক্ষণ দু'জনে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তারপরে বিদ্যুৎ বলিল,—তুমি একদিন বোলেছিলে মনে আছে যে, আমার জন্যে তুমি স্বর্গও তুচ্ছ কোরতে পারো?

—সকল সময় সকল কথা আমার মনে থাকে না বিদ্যুৎ। যখনই কোনো কথা ভুলবো, আমার মনে পড়িয়ে দিও, বেশ?

সমীরণ আস্তে আস্তে বিদ্যুতের মাথা তাহার বুকের কাছে আকর্ষণ করিল। তাহার বুকের উপর মাথা রাখিয়া বিদ্যুৎ চুপে চুপে বলিল,—গায়ে হাত দিয়ে দিব্যি করলে কি হয় জানো তো?

সমীরণ হাসিয়া বলিল,—জানি, কিছু হয় না। এখন রাত হ'য়েছে, শোওগে যাও।

বিদ্যুৎ ভালো করিয়া তাহার পাশে শুইবার স্থান সংগ্রহ করিয়া বলিল,—আজকে এইখানেই শোব যে।

—তবু ভয় গেল না ?

বিদ্যুৎ তার কাছে আরো ঘেঁসিয়া গিয়া বলিল,—তোমাদের কি বিশ্বাস আছে ?

সে সমীরণের কাপড়ের প্রান্ত বেশ করিয়া হাতের মুঠায় জড়াইয়া লইয়া বলিল,—এইবার যাও তো কেমন যাবে ?

উত্তরে সমীরণ শুধু একটু হাসিল, বলিল,—ঘুমোও।

একটু পরেই বিদ্যুৎ নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা গেল। কিন্তু সমীরণের কিছুতে ঘুম আসে না। কাল হাওড়া ষ্টেশনে তাহার অপেক্ষায় উদ্‌গ্রীব হইয়া তাহার দলের ছেলেরা দাঁড়াইয়া থাকিবে এবং দেখা না পাইয়া হতাশ ভাবে ফিরিয়া যাইবে। মেজ-.. হয়তো তাহার সম্বন্ধে নানা কথা ভাবিবেন, সহকর্ম্মীরা পরিহাস করিবে, ছোটরা নিরুৎসাহ হইয়া পড়িবে। মনে পড়িল, ভারতের কোটি-কোটি ভাই-বোন যাহাদের পেটে অন্ন নাই, দেহে সামর্থ্য নাই, চোখে দীপ্তি নাই,—যাহাদের শিক্ষা, দীক্ষা কিছুই নাই, তাহারা তাহারই মুখ চাহিয়া বসিয়া আছে। আর সে এখানে প্রিয়ার আঁচল ধরিয়া নিশ্চিন্তে রাত্রি যাপন করিতেছে। চমৎকার !

এমনি ভাবে প্রাণধারণ করিবার গ্লানি তাহার মন ধিক্কারে ভরিয়া দিল। তাহার কানে সমুদ্রের হুঙ্কার, অমোঘ আহ্বান বাজিতে লাগিল,—ঝড়ের রাত্রের হাঙ্গর-তিমিসঙ্কুল

সমুদ্র। সমীরণ অস্থির হইয়া উঠিল। দূরে একটা ঘড়ি ঢং, ঢং, ঢং, করিয়া তিনটা বাজিল।

এখনও একঘণ্টা সময় আছে। তাড়াতাড়ি করিলে এখনও কলিকাতা মেল ধরা যায়। সমীরণ অতি সন্তর্পণে উঠিয়া বসিল। সারাদিনের গুরু পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া বিদ্যুৎ অঘোরে নিদ্রা যাইতেছে। তাহার হাতের মুঠায় তখনও সমীরণের কাপড়ের প্রান্তটুকু আবদ্ধ ছিল। প্রদীপের ক্ষীণ আলোয় তার নিদ্রিত মুখের সুষমার পানে সে মুগ্ধ দৃষ্টিতে ক্ষণেক চাহিয়া রহিল, একবার একটু দ্বিধাও করিল; কিন্তু পরক্ষণে দৃঢ় হস্তে বালিসের নীচে হইতে একখানা ছোরা বাহির করিয়া অতি সন্তর্পণে কাপড়ের প্রান্তটুকু কাটিয়া লইল। তারপরে আস্তে-আস্তে খাটের নীচে নামিয়া আসিয়া বিদ্যুতের পাশে দাঁড়াইল, আস্তে-আস্তে তাহার রক্তিম অধরে একটা চুমা দিল, অশোকের বিছানার কাছে গিয়া তার গাল দুটি টিপিয়া দিয়া একটা চুমা দিল। অতৃপ্তনয়নে একবার আশোকের, একবার বিদ্যুতের মুখের পানে আবার [illegible]। বেশীক্ষণ চাহিয়া দেখিতে সাহস হইল না। [illegible] যায়, পাছে—। সমীরণ নিজের [illegible] করিতে পারিল না। আপন মনেই একবার [illegible] করিল,—